সাহিত্যচয়ন

দ্বিতীয় ভাগ

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

পশ্চিম-বঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক
অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য হিসাবে অনুমোদিত
(১৮।১০।৫৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং সিল ৬১।৫৫ দ্রষ্টব্য)

সাহিত্য-চয়ন

(নবপর্যায়)

দ্বিতীয় ভাগ

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

প্রকাশক
নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক-সমিতি
১৫, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রথম মুদ্রণ	: ডিসেম্বর ১৯৫৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ	: ডিসেম্বর ১৯৫৬
তৃতীয় মুদ্রণ	: মে ১৯৫৮
চতুর্থ মুদ্রণ	: এপ্রিল ১৯৫৯
পঞ্চম মুদ্রণ	: মার্চ ১৯৬০
ষষ্ঠ মুদ্রণ	: ফেব্রুয়ারী ১৯৬১
সপ্তম মুদ্রণ	: মার্চ ১৯৬১
অষ্টম মুদ্রণ	: ডিসেম্বর ১৯৬১
নবম মুদ্রণ	: জানুয়ারী ১৯৬২
দশম মুদ্রণ	: জানুয়ারী ১৯৬৩
একাদশ মুদ্রণ	: ডিসেম্বর ১৯৬৩
দ্বাদশ মুদ্রণ	: ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪
ত্রয়োদশ মুদ্রণ	: ডিসেম্বর ১৯৬৪
চতুর্দশ মুদ্রণ	: ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫
পঞ্চদশ মুদ্রণ	: ডিসেম্বর ১৯৬৫
ষোড়শ মুদ্রণ	: ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬
সপ্তদশ মুদ্রণ	: ডিসেম্বর ১৯৬৬
অষ্টাদশ মুদ্রণ	: ডিসেম্বর ১৯৬৭
ঊনবিংশ মুদ্রণ	: নভেম্বর ১৯৬৮
বিংশ মুদ্রণ	: ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯
একবিংশ মুদ্রণ	: ডিসেম্বর ১৯৬৯

মূল্য এক টাকা বাহান্ন পয়সা

মুদ্রাকর :
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯

নিবেদন

অষ্টম শ্রেণীর জন্য নবপ্রবর্তিত সিলেবাস অনুসারে সম্পূর্ণ নূতনভাবে সংকলিত ও সম্পাদিত, সাহিত্য-চয়ন, দ্বিতীয় ভাগ, মধ্যশিক্ষা-পর্ষদের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। সাহিত্য-চয়ন, প্রথম ভাগের ন্যায় এই পুস্তকখানিও পরীক্ষক মহোদয়দিগের নিকট উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে শুনিয়া আমাদের পরিশ্রম অনেকটা সার্থক জ্ঞান করিতেছি। এখন যাহাদের জন্য এই পুস্তকখানি এত যত্নে ও এত সতর্কতার সহিত সংকলিত হইয়াছে তাহাদের পূর্ণ প্রয়োজন ও উপকার সাধন করিলেই এই প্রয়াসের সার্থকতা সম্পূর্ণ হইবে।

পুস্তকখানির সংকলনে আমরা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বয়সোচিত মনোভঙ্গির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছি। এই বয়সের ছাত্রছাত্রীগণ সাধারণত আদর্শবাদিতা ও উচ্চ ভাবধারার উপাসক। যাহাতে এই মনোভঙ্গি যথাবিহিত-ভাবে পুষ্ট ও নিয়মিত হয় তাহার জন্য আমরা এই সংকলনে যথেষ্ট উপকরণ সরবরাহ করিয়াছি। দেশাত্মবোধ, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মহান ভাবমূলক বস্তুগুলি আবার যাহাতে সংকীর্ণতা বা বিকৃত চিন্তার বিন্দুমাত্র পরোক্ষ প্রশ্রয়ও না দেয় সেদিক দিয়াও আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, সপ্তম হইতে অষ্টম শ্রেণীর সদ্য উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীবৃন্দের বোধশক্তি, অধ্যয়ন ও সাহিত্য-পরিচয়ের সম্ভাব্য সীমার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করিয়া আমরা এই সংকলনে নূতনতর উপকরণ সন্নিবেশ করিয়াছি। অপর দিকে অষ্টম হইতে নবমের সোপান যাহাতে সহজ ও সুগম হয় সেইজন্য আমরা এই স্তরেই নবম শ্রেণীর পাঠ্য পাঠ-সংকলনে নির্বাচিত লেখকবৃন্দের সহিতও কিছু কিছু পরিচয় গড়িয়া দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিয়াছি। সেইভাবে বাংলাসাহিত্যের প্রতিনিধি-স্থানীয় লেখকদিগের সাহিত্য হইতে এমন বস্তু আহরণ করা হইয়াছে যাহাতে দুই প্রয়োজনই সাধিত হইতে পারে। সাহিত্য-চয়ন প্রথম ভাগের পর এই দ্বিতীয় ভাগে পূর্ব পরিচয় গভীরতর হইবে, অন্য দিকে পরবর্তী শ্রেণীর কঠিনতর পাঠ-ক্রমের প্রবেশপথও সহজ হইয়া উঠিবে। বাংলাসাহিত্যের পরিসীমা আজ আর

সংকীর্ণ নয়। উহার বৈচিত্র্য ও প্রসার নিত্যই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার মধ্যে নির্বাচনের দায়িত্ব স্বভাবতই দুরূহতর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর নূতন যুগের নূতনতর রুচি ও জিজ্ঞাসার দাবীও উপেক্ষণীয় নয়। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া আমরা নবযুগের কবি ও সাহিত্যিকদিগকেও এই সংকলনে কিছু কিছু স্থান দিয়াছি। সমগ্রভাবে আবার সংকলনটি যাহাতে উপভোগ্য হয় সেইজন্য বিষয়-নির্বাচনে বৈচিত্র্য বিধান করিতে হইয়াছে। প্রতিনিধি-স্থানীয় লেখকদের মধ্যেই বিচিত্র বিষয়ের সন্ধান ও আবিষ্কার যে ব্যাপক অধ্যয়ন ও অধ্যবসায়-সাপেক্ষ তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমাদের সম্পাদক-মণ্ডলী এ বিষয়ে অকুণ্ঠ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন এবং বইখানিকে সর্ববিষয়ে উৎকৃষ্ট ও মনোজ্ঞ করিবার জন্য কিছুমাত্র ত্রুটি রাখেন নাই। এইজন্য তাঁহারা আমাদের সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক-সমিতি এই পুস্তকখানির লভ্যাংশ দুঃস্থ শিক্ষক ও শিক্ষকদিগের অনাথ শিশুদের জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রতি বিদ্যালয়ে ইহার স্থান অবশ্যম্ভাবী জানিয়া সমিতি ইহার মুদ্রণ ও মনোহারিত্বের জন্য অকৃপণ হস্তে অর্থব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু লভ্যাংশের কথা গৌণ বিবেচনার বস্তু,—মুখ্য লক্ষ্য আমাদের ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন মিটানো। সেইজন্যই আরও বেশী করিয়া পুস্তকখানির সর্বাঙ্গীণ সৌন্দর্যবিধানে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং সকল দিক দিয়াই পুস্তকখানির দাবী অগ্রগণ্য। বাংলার প্রতি বিদ্যালয়ে নিশ্চয় ইহার স্থান হইবে ইহাই আমাদের ভরসা।

কলিকাতা
২০শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫

সাধারণ সম্পাদক
নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক-সমিতি

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

পরিশিষ্ট

ভারতের সম্পদ

স্বামী বিবেকানন্দ



ভূমধ্যসাগর আর লোহিতসাগরের সংযোগ হয়ে, ইউরোপ আর ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা হয়েছে। মানবজাতির উন্নতির বর্তমান অবস্থার জন্যে যতগুলি কারণ প্রাচীন কাল থেকে কাজ করছে, তার মধ্যে বোধ হয়, ভারতের বাণিজ্য সর্বপ্রধান। অনাদি কাল হতে, উর্বরতায় আর বাণিজ্য-শিল্পে, ভারতের মতো দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার যত সুতি কাপড়, তুলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মতি ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে পর্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হতে যেত। তাছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমি পশমিনা কিংখাব ইত্যাদি এ দেশের মতো কোথাও হত না। আবার লবঙ্গ এলাচ মরিচ জায়ফল জয়িত্রি প্রভৃতি নানাবিধ মশলার স্থান, ভারতবর্ষ। কাজেই অতি প্রাচীন কাল হতেই, যে দেশ যখন সভ্য হত, তখন ঐ সকল জিনিসের জন্য ভারতের উপর নির্ভর করত। এই বাণিজ্য দুটি প্রধান ধারায় চলত; একটি ডাঙাপথে আফগানি ইরানি দেশ হয়ে, আর-একটি জলপথে রেড্-সি হয়ে। সিকন্দর শা, ইরান-বিজয়ের পর, নিয়ার্কুস নামক সেনাপতিকে জলপথে সিন্ধুনদের মুখ হয়ে সমুদ্র পার হয়ে লোহিতসমুদ্র দিয়ে রাস্তা দেখতে পাঠান। বাবিল ইরান গ্রীস রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য যে কত পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যের উপর নির্ভর করত, তা অনেকে জানে না। রোম-ধ্বংসের পর মুসলমানি বোগদাদ ও ইতালীয় ভিনিস্ ও জেনোয়া, ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান পাশ্চাত্য কেন্দ্র হয়েছিল। যখন তুর্কেরা রোম সাম্রাজ্য দখল করে ইতালীয়দের ভারত-বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ করে দিলে, তখন জেনোয়ানিবাসী কলম্বাস (ক্রিস্টোফার কলম্বাস), আটলাণ্টিক পার হয়ে ভারতে আসবার নূতন

রাস্তা বার করবার চেষ্টা করেন, ফল—আমেরিকা মহাদ্বীপের আবিষ্ক্রিয়া। আমেরিকায় পৌঁছেও কলম্বাসের ভ্রম যায় নি যে, এ ভারতবর্ষ নয়। সেই-জন্যেই আমেরিকার আদিম নিবাসীরা এখনও ইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত।

এদিকে পোর্তুগীসরা ভারতের নূতন পথ, আফ্রিকা বেড়ে, আবিষ্কার করলে। ভারতের লক্ষ্মী পোর্তুগালের উপর সদয় হলেন; পরে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ। ইংরেজের ঘরে ভারতের বাণিজ্য রাজস্ব সমস্তই; তাই ইংরেজ এখন সকলের উপর বড়ো জাত। তবে আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতের জিনিসপত্র অনেক স্থলে ভারত অপেক্ষাও উত্তম উৎপন্ন হচ্ছে, তাই ভারতের আর তত কদর নাই। এ কথা ইউরোপীয়েরা স্বীকার করতে চায় না। ভারত যে তাদের ধন সভ্যতার প্রধান সহায় ও সম্বল, সে কথা মানতে চায় না, বুঝতে চায় না। আমরাও বোঝাতে কি ছাড়ব? ভেবে দেখো কথাটি কী। ঐ যারা চাষাভুষা তাঁতি জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য বিজাতিবিজিত স্বজাতি-নিন্দিত ছোটোজাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না। হে ভারতের শ্রমজীবি! তোমার নীরব, অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলেকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস্, জেনোয়া, বাগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি? কে ভাবে একথা। যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা। বড়ো কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, ১০ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য,—সে তোমরা—ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী!—তোমাদের প্রণাম করি।

('পরিব্রাজক' হইতে সংকলিত)



গঙ্গাবক্ষে

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭৬৮ শকের শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্ষাতেই গঙ্গাতে বেড়াইতে বাহির হইলাম। আমার ধর্মপত্নী সারদা দেবী কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যদি যাইতেই হয়, তবে, আমাকে সঙ্গে করিয়া লও।" আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইলাম। তাঁহার জন্য একটা পিনিস ভাড়া করিলাম। তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং হেমেন্দ্রনাথকে লইয়া তাহাতে উঠিলেন—আমি রাজনারায়ণ বসুকে সঙ্গে লইয়া নিজের একটি সুপ্রশস্ত বোটে উঠিলাম।

তখনকার সেই শ্রাবণ মাসের প্রবল স্রোত আমাদের বিপক্ষে, তাহার প্রতিকূলে, অতি কষ্টে, আস্তে আস্তে, চলিতে লাগিলাম। হুগলী আসিতেই তিন চারি দিন কাটিয়া গেল। আর দুই দিন পরে কাল্‌নাতে আসিয়া মনে হইল, যেন কতদূরেই আসিয়াছি। এইরূপে চলিতে চলিতে পাটুলি পশ্চাৎ করিয়া একদিন বেলা চারিটার সময় আমি রাজনারায়ণ বাবুকে বলিলাম, আজ তোমার দৈনন্দিন লেখা শেষ করিয়া ফেলো। আজ প্রকৃতির শোভা বড়োই দীপ্তি পাইতেছে, চলো, আমরা বোটের ছাদের উপরে গিয়া বসি। তিনি বলিলেন যে, এখনও বেলার অনেক বাকি, ইহার মধ্যে আমার দৈনন্দিনের জন্য কত ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহা কে জানে? এইরূপে তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা হইতেছে এমন সময় দেখি, পশ্চিমের আকাশে ঘটা করিয়া একটা মেঘ উঠিতেছে। তখন একটা ভারি ঝড়ের আশঙ্কা হইল। রাজনারায়ণ বাবুকে বলিলাম, চলো আমরা পিনিসে যাই। ঝড়ের সময় বোটে থাকা ভালো নয়। মাঝি পিনিসের সঙ্গে বোট লাগাইয়া দিল। আমি সিঁড়িতে পা ঝুলাইয়া বোটের ছাদের উপর

বসিয়া আছি এবং দুইজন দাঁড়ি পিনিসের সঙ্গে মিলাইয়া বোট ধরিয়া আছে। অন্য একটা নৌকা গুণ টানিয়া যাইতেছিল, তাহাদের নৌকার গুণ আমাদের বোটের মাস্তুলের আগায় লাগিয়া গেল। সেই গুণ আমাদের একজন দাঁড়ি লগি দিয়া ছাড়াইতেছিল। আমি সেই গুণ ছাড়ানো দেখিতেছি। যে দাঁড়ি গুণ ছাড়াইতেছিল, সে সেই বাঁশের লগির ভার সামলাইতে পারিল না। তাহার হাত হইতে লগি আমার মস্তকের উপর পড় পড় হইল। সামাল, সামাল রব পড়িয়া গেল, মহা গোল উঠিল। আমি তখনও সেই মাস্তুলের দিকে তাকাইয়া আছি। দাঁড়ি সাধ্যমতো চেষ্টা করিয়া আমার মস্তক বাঁচাইল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সামলাইতে পারিল না। লগির কোণ আসিয়া আমার চক্ষুর কোণে চশ্‌মার তারের উপর পড়িল। চক্ষুটা বাঁচিয়া গেল, কিন্তু চশ্‌মার তার আমার নাসিকা কাটিয়া বসিয়া গেল। আমি টানিয়া চশ্‌মা তুলিয়া ফেলিলাম, আর দর দর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ছাদ হইতে নামিয়া তখন আমি নীচে বোটের কিনারায় বসিয়া রক্ত ধুইতে লাগিলাম। ঝড়ের কথা মনে নাই, সকলেই একটু অসাবধান। দাঁড়িরা পিনিস ধরিয়া আছে এবং সেই অবস্থায় বোট লইয়া পিনিস চলিতেছে। এমন সময় একটা দমকা ঝড় আসিয়া পিনিসের মাস্তুলের একটি শাখা ভাঙিয়া ফেলিল। সেই ভগ্ন মাস্তুলটি তাহার পাল দড়াদড়ি লইয়া বোটের মাস্তুলকে জড়াইয়া তাহার ছাদের উপর পড়িল। সেইখানে আমি পূর্বে বসিয়াছিলাম। এখন তাহা আমার মস্তকের উপর ঝুলিতে লাগিল। পিনিস অবশিষ্ট পাল-ভরে ঝড়ে ছুটিতে লাগিল এবং বোটকে আকৃষ্ট করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিল। যে দুইজন দাঁড়ি পিনিস ধরিয়া আছে তাহারা আর ঠিক রাখিতে পারে না। বোট পিনিসের টানে এক-কেতে হইয়া চলিল। সে দিকটা জলের সঙ্গে প্রায় মিশাইয়া পড়িল; কেবল এক আঙুল মাত্র জল হইতে ছাড়া। মাস্তুলের জড়ানো দড়ি কাটিয়া দিবার জন্য একটা গোল পড়িয়া গেল। আন্‌ দা, আন্‌ দা। কিন্তু দা কেহ খুঁজিয়া পায় না। একখানা ভোঁতা দা লইয়া একজন মাস্তুলের উপর উঠিল। আঘাতের পর আঘাত, তার পরে আঘাত কিন্তু এ ভোঁতা দায়ে দড়ি কাটে না। অনেক কষ্টে একটা দড়ি কাটিল, দুইটা কাটিল। তৃতীয়টা কাটিতেছে, আমি আর রাজনারায়ণ বাবু স্তব্ধ হইয়া জলের দিকে তাকাইয়া আছি। এ নিমিষে আছি, পর নিমিষে আর নাই, জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি।

রাজনারায়ণবাবুর চক্ষু স্থির, বাক্য স্তব্ধ, শরীর অসাড়। এদিকে দাঁড়রা বলিয়া উঠিল, আবার তাই রে, তাই। বলিতে বলিতে শেষ দড়িটা কাটিয়া ফেলিল। বোট নিষ্কৃতি পাইয়া তীরের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে ওপারে চলিয়া গেল এবং পাড়ের সঙ্গে সমান হইয়া দাঁড়াইল। আমি অমনি বোট হইতে ডাঙায় উঠিয়া পড়িলাম, রাজনারায়ণ বাবুকেও ধরাধরি করিয়া তুলিলাম। এখন ডাঙা পাইয়া আমাদের প্রাণ বাঁচিল, কিন্তু পিনিস তখনও দৌড়িতেছে। দাঁড়িরা চেঁচাইতে লাগিল, "থামা, থামা"। তখন সূর্য অস্ত গেল। পিনিস থামিল কি না অন্ধকারে ভালো দেখিতে পাইতেছি না। ওদিকে দেখি, একটা ছোটো নৌকা বেগে আমাদের বোটের দিকে আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই নৌকা আমাদের বোটকে ধরিল। আমি বলিলাম, এ আবার কী? ডাকাতের নৌকা নাকি? আমার ভয় হইল। সেই নৌকা হইতে লাফাইয়া একজন পাড়ের উপর উঠিল, দেখি যে, আমার বাড়ির সেই স্বরূপ খানসামা। তাহার মুখ শুষ্ক। সে আমাকে একখানা চিঠি দিল। সেই অন্ধকারে অনেক চেষ্টা করিয়া যাহা পড়িলাম তাহাতে বোধ হইল, ইহাতে আমার পিতার মৃত্যু-সংবাদ আছে। সে বলিল, কলিকাতা তোলপাড় হইয়া গিয়াছে। আপনার খোঁজে নৌকা করিয়া কত লোক বাহির হইয়াছে। কেহ আপনাকে ধরিতে পারে নাই, আমার এত কষ্ট সার্থক যে, আমি আপনাকে ধরিলাম। এ সংবাদ হঠাৎ বজ্রপাতের ন্যায় আমার মস্তকে পড়িল। আমি স্তব্ধ ও বিষণ্ণ হইয়া বোট লইয়া পিনিস ধরিতে গেলাম এবং সেই পিনিস ধরিয়া তাহাতে উঠিলাম, সেখানে আলোতে পত্রখানা স্পষ্ট করিয়া পড়িলাম। এখন আর কী হইবে। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ এখন আর কাহাকেও শুনাইলাম না। পরদিন প্রাতঃকালেই কলিকাতা অভিমুখে ফিরিলাম। আমি যে বোটে ছিলাম তাহা ১৪টা দাঁড়ের বোট, ইহার ভিতরকার দুই পার্শ্বে বেঞ্চের উপরে আঁটা তক্তা, তাহাতে দীর্ঘ ফরাস পাতা। আমি স্ত্রী-পুত্রাদিগকে তাহাতে লইলাম। রাজনারায়ণ বাবুকে সমস্ত পিনিসের অধিকার দিয়া পশ্চাতে ধীরে ধীরে তাঁহাকে আসিতে বলিলাম। ভাদ্র মাসের গঙ্গার স্রোতে দাঁড়ে পালে নক্ষত্রবেগে বোট ছুটিল। কিন্তু মন তাহার আগে ছুটিতেছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অনবরত বৃষ্টির ও বাতাসের কোলাহল। মধ্যপথে কাল্‌নাতে পঁহুছিবার কিছু পূর্বে এক মাঠের ধারে এমন তুফান উঠিল যে, নৌকা ডুবু

ডুবু হইয়া পড়িল। নৌকা কিনারা দিয়াই যাইতেছিল। মাঝিরা তৎক্ষণাৎ ডাঙায় লাফাইয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি সম্মুখের একটা মুড়া গাছে তাহা বাঁধিয়া ফেলিল। বোট রক্ষিত হইল। তখন সেই মুড়া গাছটিকে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় এবং পরম বন্ধু বলিয়া আমার মনে হইল। পাঁচ মিনিট পরেই আবার আমার মনের আবেগে বোট খুলিয়া দিলাম। যখন বেলা প্রায় অবসান, তখন আমি মেঘের মধ্য দিয়া ক্ষীণপ্রভ সূর্যকে একবার দেখিতে পাইলাম। তখন আমি সুখসাগরে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। সূর্য যখন অস্ত হইল, তখন আমি ফরাসডাঙায়। সেখানে দাঁড়িদের হাত অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর আর তাহারা খাটিতে পারে না। আবার জোয়ার আসিয়া পঁহুছিল। এ বিষম ব্যাঘাত। এখান হইতে পল্‌তায় আসিতে রাত্রি ৮টা হইল। এখানে আসিয়া বোট কাত হইয়া পড়িল। দিন দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রমাগত বৃষ্টি পড়িয়াছে। এক একবার দমকা বাতাসে দুই-এক জায়গায় ভয়ে বোট থামাইতেও হইয়াছিল। দাঁড়িরা বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া শীতে কাঁপিতেছে। পল্‌তায় পঁহুছিতেই কিনারা হইতে লোক আসিয়া সংবাদ দিল, এখানে গাড়ি প্রস্তুত আছে। এই কথা শুনিয়া আমার শরীরে প্রাণ আসিল। আমি সেই যে বোটে বসিয়াছিলাম একবারও তাহা হইতে উঠি নাই, এখন গাড়ির কথা শুনিয়া সেখান হইতে উঠিয়া বোটের দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি যে, সেখানে আমার এক হাঁটু জল। সমস্ত নৌকার খোল জলে পুরিয়া গিয়া তাহার উপরে এক হাত পর্যন্ত জল দাঁড়াইয়াছে। সকলই বৃষ্টির জল। আমি তাহা পূর্বে জানিতেও পারি নাই। যদি পল্‌তায় গাড়ি না থাকিত—যদি আমরা নৌকায় বরাবর কলিকাতার দিকে চলিতাম, তবে পথে জলভারে বোট নিশ্চয়ই ডুবিত; এ কথা আর কাহাকে বলিতেও পারিতাম না। বোট হইতে নামিয়া গাড়িতে চড়িলাম। রাস্তা জলময়—সেই জলের ভিতরে গাড়ির চাকা অর্ধেক মগ্ন। অতি কষ্টে বাড়ি পঁহুছিলাম, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। সকলেই নিদ্রিত, কাহারও সাড়াশব্দ নাই। বাড়ির ভিতরে স্ত্রীপুত্রাদিগকে প্রেরণ করিয়া আমি বৈঠকখানার তেতলায় উঠিলাম।

('আত্মজীবনী' হইতে সংকলিত)



শৈলেশ্বরের মন্দিরে

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারনের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল-গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্বসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর, কী জানি, যদি কালধর্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা-বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্যাস্ত হইল; ক্রমে নৈশগগন নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমত ঘোরতর অন্ধকার দিগন্ত-সংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্ত-প্রদর্শিত পথে কোনোমতে চলিতে লাগিলেন।

অল্পকালমধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রধাবিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্যপথের আর কিছুমাত্র স্থিরতা পাইলেন না। অশ্ব-বল্গা শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া ঘোটকচরণে কোনো কঠিন দ্রব্যসংঘাতে ঘোটকের পদস্খলন হইল। ঐ সময় একবার বিদ্যুৎ প্রকাশ হওয়াতে পথিক সম্মুখে প্রকাণ্ড ধবলাকার কোনো পদার্থ চকিতমাত্র দেখিতে পাইলেন। ঐ ধবলাকার স্তূপ অট্টালিকা হইবে, এই বিবেচনায়, অশ্বারোহী লাফ দিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন। অবতরণমাত্র জানিতে পারিলেন যে, প্রস্তর-নির্মিত সোপানাবলীর সংস্রবে ঘোটকের চরণ স্খলিত হইয়াছিল; অতএব নিকটে আশ্রয়স্থান আছে জানিয়া অশ্বকে ছাড়িয়া দিলেন। নিজে অন্ধকারে সাবধানে

সোপানমার্গে পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ তড়িতালোকে জানিতে পারিলেন যে, সম্মুখস্থ অট্টালিকা এক দেবমন্দির। কৌশলে মন্দিরের ক্ষুদ্র দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, দ্বার রুদ্ধ, হস্তমার্জনে জানিলেন, দ্বার বহির্দিক হইতে রুদ্ধ হয় নাই।

এই জনহীন প্রান্তরস্থিত মন্দিরে এমত সময়ে কে ভিতর হইতে অর্গল আবদ্ধ করিল, এই চিন্তায় পথিক কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। মস্তকোপরি প্রবলবেগে ধারাপাত হইতেছিল, সুতরাং যে কোনো ব্যক্তি দেবালয়-মধ্যবাসী হউক, পথিক করাঘাত করিতে লাগিলেন, কেহই দ্বারোন্মোচন করিতে আসিল না। ইচ্ছা, পদাঘাতে কবাট মুক্ত করেন, কিন্তু দেবালয়ের পাছে অমর্যাদা হয়, এই আশঙ্কায় ততদূর করিলেন না, তথাপি তিনি কবাটে যে দারুণ করপ্রহার করিতেছিলেন, কাষ্ঠের কবাট তাহা অধিকক্ষণ সহিতে পারিল না, অল্পকালেই অর্গলচ্যুত হইল। দ্বার খুলিয়া যাইবামাত্র যুবা যেমন মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অমনি মন্দিরমধ্যে অস্ফুট চীৎকারধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল ও তন্মুহূর্তে মুক্তদ্বারপথে ঝটিকাবেগ প্রবাহিত হওয়াতে তথায় যে ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহা নিবিয়া গেল। মন্দিরমধ্যে মনুষ্যই বা কে আছে, দেবই বা কী মূর্তি, প্রবিষ্ট ব্যক্তি তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আপনার অবস্থা এইরূপ দেখিয়া, নির্ভীক যুবাপুরুষ কেবল হাস্য করিয়া প্রথমত ভক্তিভাবে মন্দিরমধ্যস্থ অদৃশ্য দেবমূর্তির উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া অন্ধকারমধ্যে ডাকিয়া কহিলেন, "মন্দিরমধ্যে কে আছ?" কেহই প্রশ্নের উত্তর করিল না। পুনর্বার কহিলেন, "যে কেহ মন্দিরমধ্যে থাক, শ্রবণ করো; এই আমি সশস্ত্র দ্বারদেশে বসিলাম, আমার বিশ্রামের বিঘ্ন করিও না। বিঘ্ন করিলে, যদি পুরুষ হও, তবে ফলভোগ করিবে; আর যদি স্ত্রীলোক হও, তবে নিশ্চিত হইয়া নিদ্রা যাও, রাজপুত-হস্তে অসিচর্ম থাকিতে তোমাদিগের পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না।"

"আপনি কে?" বামাস্বরে মন্দিরমধ্য হইতে এই প্রশ্ন হইল। শুনিয়া সবিস্ময়ে পথিক উত্তর করিলেন, "আমার পরিচয়ে আপনার কী হইবে?"

মন্দিরমধ্য হইতে উত্তর হইল, "আমরা বড়ো ভীত হইয়াছি।"

যুবক তখন কহিলেন, "আমি যেই হই, আমাদিগের আত্মপরিচয় দিবার

রীতি নাই। কিন্তু আমি উপস্থিত থাকিতে অবলাজাতির কোনোপ্রকার বিঘ্নের আশঙ্কা নাই।"

রমণী উত্তর করিল, "আপনার কথা শুনিয়া আমার সাহস হইল; এতক্ষণ আমরা ভয়ে মৃতপ্রায় ছিলাম। এখনও আমার সহচরী অর্ধমূর্ছিতা রহিয়াছেন। আমরা সায়াহ্নকালে এই শৈলেশ্বর শিবপূজার জন্য আসিয়াছিলাম। পরে ঝড় আসিলে আমাদিগের বাহক ও দাসদাসীগণ আমাদিগকে ফেলিয়া কোথায় গিয়াছে, বলিতে পারি না।"

যুবক কহিলেন, "চিন্তা করিবেন না, আপনারা বিশ্রাম করুন, কাল প্রাতে আমি আপনাদিগকে গৃহে রাখিয়া আসিব।"

রমণী কহিল, "শৈলেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

অর্ধরাত্রে ঝটিকা-বৃষ্টি নিবারিত হইলে যুবক কহিলেন, "আপনারা এইখানে কিছুকাল কোনোরূপে সাহসে ভর করিয়া থাকুন। আমি একটা প্রদীপ সংগ্রহের জন্য নিকটবর্তী গ্রামে যাই।"

এই কথা শুনিয়া, যিনি কথা কহিতেছিলেন, তিনি কহিলেন, "মহাশয়, গ্রাম পর্যন্ত যাইতে হইবে না। এই মন্দিরের রক্ষক একজন ভৃত্য অতি নিকটেই বসতি করে। জ্যোৎস্না প্রকাশ হইয়াছে, মন্দিরের বাহির হইতে তাহার কুটীর দেখিতে পাইবেন। সে ব্যক্তি একাকী প্রান্তরমধ্যে বাস করিয়া থাকে, এজন্য সে গৃহে সর্বদা অগ্নি জ্বালিবার সামগ্রী রাখে।"

যুবক এই কথানুসারে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া জ্যোৎস্নার আলোকে দেবালয়-রক্ষকের গৃহ দেখিতে পাইলেন। গৃহদ্বারে গমন করিয়া তাহার নিদ্রা-ভঙ্গ করিলেন। মন্দির-রক্ষক ভয়প্রযুক্ত দ্বারোদ্ঘাটন না করিয়া, প্রথমে অন্তরাল হইতে কে আসিয়াছে দেখিতে লাগিল। বিশেষ পর্যবেক্ষণে পথিকের কোনো দস্যুলক্ষণ দৃষ্ট হইল না, বিশেষত তৎস্বীকৃত স্বর্ণমুদ্রার লোভ সংবরণ করা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। সাতপাঁচ ভাবিয়া মন্দির-রক্ষক দ্বার খুলিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিল।

পান্থ প্রদীপ আনিয়া দেখিলেন, মন্দিরমধ্যে শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত শিবমূর্তি স্থাপিত আছে। সেই মূর্তির পশ্চাদ্ভাগে দুইজন মাত্র কামিনী। তিনি সবিস্ময়ে ইহাও পর্যবেক্ষণ করিলেন যে, তদুভয়মধ্যে কাহারও পরিচ্ছদ

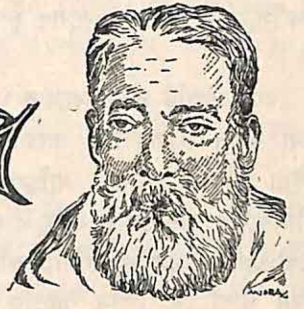
এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় নহে, উভয়েই পশ্চিমদেশীয় অর্থাৎ হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকদিগের বেশধারিণী। যুবক মন্দিরাভ্যন্তরে উপযুক্ত স্থানে প্রদীপ স্থাপন করিয়া রমণীদিগের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার শরীরোপরি দীপরশ্মিসমূহ প্রপতিত হইলে রমণীরা দেখিলেন যে, পথিকের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিন্মাত্র অধিক হইবে; মনোজ্ঞ কান্তি, বসন্ত-প্রসূত নবপত্রাবলীতুল্য বর্ণোপরি কবচাদি রাজপুতজাতির পরিচ্ছদ শোভা করিতেছিল, কটিদেশে কটিবন্ধে কোষসংবদ্ধ অসি, দীর্ঘ করে দীর্ঘ বর্শা ছিল, মস্তকে উষ্ণীষ, তদুপরি একখন্ড হীরক, কর্ণে মুক্তাসহিত কুণ্ডল, কণ্ঠে রত্নহার।

উভয় পক্ষই পরস্পরের পরিচয় জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু কেহই প্রথমে পরিচয় জিজ্ঞাসার অভদ্রতা স্বীকার করিতে সহসা ইচ্ছুক হইলেন না।

('দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের প্রথমাংশ হইতে সংকলিত)

পিতৃদেব

শিবনাথ শাস্ত্রী



আমার পূজনীয় পিতৃদেব হরানন্দ ভট্টাচার্য মুখে আমাদিগকে কখনো নীতির উপদেশ দেন নাই; কিন্তু তাঁহাতে জীবননীতি দেখিয়াছি।

একবার গ্রীষ্মকালে আমাদের গ্রামের একজন প্রতিবেশী ভদ্রলোকের পুষ্করিণীর মাছ মরিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে আমাদের চাকরানী বাসন মাজিতে গিয়া একটা বড়ো মাছ আনিল। আনিয়া মাকে বলিল, "মা অমুকদের পুকুরে রাত্রে অনেক মাছ মরে ভেসে উঠেছে। পাড়ার লোক নিয়ে যাচ্ছে, তাই আমিও একটা এনেছি।" মা মনে করিলেন, পাড়ার সকল লোকে যখন লইয়া যাইতেছে, তখন বুঝি বাড়িওয়ালারা সকলকে বিলাইতেছে। তাই তিনি আর কিছু বলিলেন না।

তারপর বাজারের সময় বাবা মার কাছে পয়সা চাহিলেন; মা আনাজ তরকারি প্রভৃতি কিনিবার পয়সা দিলেন, মাছের পয়সা দিলেন না।

বাবা। কই, মাছের পয়সা দিলে না? মাছ কি আজ আসবে না?

মা। আজ মাছ আনতে হবে না। মাছ আছে। অমুকদের পুকুরে রাত্রে অনেক মাছ মরে ভেসে উঠেছে, লোকে নিয়ে যাচ্ছে, ঝিও একটা এনেছে।

বাবা শুনিয়া একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া গেলেন, তাঁহার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইল। চুপড়িসুদ্ধ কোটা-মাছ দেখিবার জন্য আনাইলেন, ঝিকে গালাগালি করিতে লাগিলেন, কেবল মারিতে বাকি রাখিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই কোটা-মাছসুদ্ধ চুপড়ি সেই গৃহস্থের বাড়ি পাঠাইলেন, তৎপর মাছ কিনিবার জন্য বাজারে গেলেন। আমরা ইহা দেখিলাম। ইহার পরে কি আর

নাকীস্বরে—"দেখো শিশুগণ, চুরি করা বড়ো পাপ," এরূপ উপদেশ আবশ্যক হয়?

আর একটি ঘটনা আমার মনে দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া ছিল, এজন্য মনে আছে। বাবা তখন কলিকাতায় বাংলা পাঠশালায় পণ্ডিতি করেন। তিনি আমাকে লইয়া গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়িতে গিয়াছেন। সে সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়া চারিদিকের গরিবলোক বড়ো কষ্ট পাইতেছে। তাহাদের সাহায্যের জন্য গভর্নমেণ্ট একটা রিলীফ কমিটি করিয়াছেন। বাবার প্রতি ঐ কমিটির সভ্যগণের এমন শ্রদ্ধা যে, তিনি যাহাকে সাহায্যের উপযুক্ত বলেন, তাহাকেই তাঁহারা সাহায্য দেন। ইহার কারণও ছিল। কাহাকেও সার্টিফিকেট দিতে হইলে, বাবা তাহার গ্রামে গিয়া তাহার উনান পর্যন্ত না দেখিয়া আসিয়া তাহাকে সাহায্যের উপযুক্ত বলিতেন না। আমাদের কলিকাতা যাত্রা করিবার সময়-সময় বাবা একদিন শুনিলেন যে, আমাদের গ্রাম হইতে তিন-চারি মাইল দূরে কোনো চাষী লোক সপরিবারে অনাহারে আছে। শুনিয়া নিজের গোলা হইতে দুই পালি চাউল কাপড়ে বাঁধিয়া হাঁটিয়া তাহাদিগকে দিতে গেলেন। গিয়া তাঁহাদিগকে বলিয়া আসিলেন, "পরশু হাটবার তোমরা আমার কাছে যেও, আমি সঙ্গে করে তোমাদিগকে রিলীফ কমিটির বাবুদের কাছে নিয়ে সাহায্য পাবার বন্দোবস্ত করে দেব।" তখন তাঁহার মনে ছিল না যে তৎপরদিনেই আমাদিগকে কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে, এবং সেই হাটবারের দিনই তাঁহাকে স্কুলের শিক্ষকতা করিবার জন্য কলিকাতা উপস্থিত হইতে হইবে এবং অনুপস্থিত থাকিলে ছুটির দুইমাসের বেতন কাটা যাইবে। তখন এইরূপই নিয়ম ছিল।

তৎপরদিন যথাসময়ে শালতি ভাড়া করিয়া দুইজনে কলিকাতার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছি। আমাদের গ্রাম হইতে প্রায় তিন-চারি মাইল পথ আসিয়াছি, আমি শালতির মধ্যে বসিয়া চারিদিকের মাঠঘাট গাছপালা দেখিতেছি, বাবা বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। হঠাৎ বাবা শালতির ডালিতে আঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওই যাঃ, বড়ো ভুল হয়েছে। ওরে, থাম, থাম, ফিরে যেতে হবে।" শালতির চালকগণ জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি মশাই? এতদূরে এসে ফিরে যাবেন?"

বাবা। হাঁ ফিরে যেতে হবে, একটা বড়ো ভুল হয়েছে। তোমরা ভেবো না, তোমাদের যা দেব বলেছি, তা দেব। তোমাদের অপরাধ কী? আমি ভাড়া না করলে তোমরা অন্য ভাড়াটে পেতে।

আমি। বাবা, আপনাকে কাল স্কুলে তো উপস্থিত হতেই হবে, তা না হলে দুমাসের মাইনে কাটা যাবে।

বাবা। তা কী হবে? মহেশ কাওরা-রা অনাহারে সপরিবারে মারা যায়। আমি হাটবার তাদের আসতে বলেছি। সঙ্গে করে নিয়ে রিলীফ কমিটির কাছ থেকে তাদের সাহায্য পাবার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। আমি গরিবদের কাছে কথা দিয়েছি, ভুলে গিয়েছিলাম। এখন মনে হয়েছে, তা ভেঙে যেতে পারি না।

আমরা আবার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। বাবাকে পুরা শালতির ভাড়া দিতে হইল, স্কুলের বেতন কাটা তো পরে রহিল।

সৌভাগ্যক্রমে সে যাত্রা বাবার দুমাসের বেতন কাটার শাস্তিটা আর ভোগ করিতে হইল না। বাবা কলিকাতায় আসিয়া, কেন একদিন কামাই হইয়াছিল তাহার সবিশেষ বিবরণ কর্তৃপক্ষকে লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ আর বেতন কাটিলেন না।

তৃতীয় ঘটনা যাহা উজ্জ্বলরূপে মনে আছে, তাহা এই। বাবা তখন আমাদের গ্রামের হার্ডিঞ্জ মডেল বাংলা স্কুলে হেড পণ্ডিতের কাজ করেন। একবার গভর্নমেণ্ট স্কুলঘর মেরামতের জন্য বাবার নিকট কিছু টাকা পাঠাইলেন। স্কুলঘর মেরামত হইয়া গেলে কতকগুলি শালের খুঁটি প্রভৃতি বাঁচিল। সেগুলি কী করিতে হইবে, অন্য কোনো গ্রামের স্কুলগৃহের মেরামতে যাইবে, কি নিলাম করিয়া গভর্নমেণ্টের হস্তে টাকা জমা দিতে হইবে, ইহা জানিবার জন্য বাবা গভর্নমেণ্টকে পত্র লিখিলেন। চিঠির উত্তর আর আসে না। দু-এক মাস অপেক্ষা করিয়া অবশেষে বাবা স্কুলগৃহের নিকটস্থ পুষ্করিণীতে খুঁটিগুলি ডুবাইয়া রাখিতে বলিলেন। সেইরূপ রাখা হইল।

কিছুদিন পরে আমি যখন গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি গিয়াছি তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা বাবা ঘরের দাবাতে বসিয়া তামাক খাইতেছেন, এমন সময় একজন গ্রামস্থ ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিলেন।

সমাগত ব্যক্তি। পণ্ডিত মশাই, প্রণাম হই।

বাবা। এসো বাপু! কল্যাণ হোক! ওঠো, দাবাতে বসো, তামাক খাও।

সমাগত ব্যক্তি। থাক আর দাবাতে উঠব না। অল্প কথা, তাই নীচে থেকেই বলে যাচ্ছি। জিজ্ঞাসা করি, ঐ স্কুলের পুকুরে যে খুঁটিগুলি ডুবিয়ে রেখেছেন, ওগুলো কী হবে?

বাবা। কী হবে তা জানি না। গভর্নমেণ্টের জিনিস। তাঁদের পত্র লিখেছি। হয়, অন্য কোনো স্কুলের মেরামতের জন্য যাবে; না হয় নিলাম করে বিক্রি করতে হবে।

সমাগত ব্যক্তি। ও খুঁটিগুলো আমাকে দিয়ে দিন না? আপনাকে আমি কিছু ধরে দিচ্ছি।

বাবা প্রথমে ঐ লোকটির প্রস্তাবের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, খুঁটিগুলি কিনিতে চায়। তাই বলিলেন, "তুমি কি আমার কথা শুনতে পেলে না? ওগুলো গভর্নমেণ্টের জিনিস। তাঁরা যেরূপ করতে বলবেন, তাই হবে। তাঁদের হুকুম ভিন্ন কি বেচতে পারি?"

সমাগত ব্যক্তি। আমি আপনার কথা শুনতে পেয়েছি। আমি একখানা ঘর তুলছি, খুঁটির প্রয়োজন। আমি আপনাকে দশ-বারো টাকা ধরে দিচ্ছি, আমাকে খুঁটিগুলো দিন না?

এতক্ষণে সমাগত ব্যক্তির হৃদ্গত কথা বাবার হৃদয়ংগম হইল। তিনি অনুভব করিলেন যে ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে ঘুষ দিতে চাহিতেছে। তখন একেবারে লম্ফ দিয়া দাবা হইতে পড়িয়া তাহার হাত ধরিলেন, এবং বলিলেন, "তুমি এমন ছোটোলোক যে তুমি আমাকে দশ-বারো টাকা ঘুষ দিয়ে খুঁটিগুলো অমনি নিতে চাও! আর আমাকেও এমন ছোটোলোক মনে করেছ যে, পরের ধন ঘুষ নিয়ে তোমাকে দেব! চলো তোমাকে থানায় নিয়ে যাব, তুমি নিশ্চয়ই ঐ খুঁটির কিছু চুরি করেছ।"

এই বলিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন। আমি মাঝখানে পড়িয়া ছাড়াইয়া দিলাম। আমি বলিলাম, "বাবা, খুঁটি তো গোনা আছে। কাল স্কুলে গিয়ে খুঁটি তুলিয়ে গুনে দেখবেন, যদি কম হয় তখন না হয় এই ব্যক্তির নামে থানায় খবর দেবেন। এখন একে ছেড়ে দিন।" অনেক বলাতে তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

('আত্মচরিত' হইতে সংকলিত)

ছুটি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট্ করিয়া একটা নূতন ভাবোদয় হইল। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির কাঠ, আবশ্যককালে তাহার যে কতখানি বিস্ময় বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গুঁড়ির উপরে গিয়া বসিল; ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসীন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু-আধটু ঠেলিল, কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকলপ্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল, "দেখ্, মার খাবি, এইবেলা ওঠ্।"

সে তাহাতে আরও একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীরূপে দখল করিয়া লইল।

এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কষাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল—সাহস হইল না। কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল, যেন ইচ্ছা করিলেই এখনি উহাকে রীতিমতো শাসন করিয়া দিতে পারে; কিন্তু করিল না, কারণ পূর্বাপেক্ষা

আর-একটা ভালো খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর-একটু বেশি মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে-সুদ্ধ ঐ কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক।

মাখন মনে করিল, ইহাতে তাহার গৌরব আছে; কিন্তু অন্যান্য পার্থিব গৌরবের ন্যায় ইহার আনুষঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাহা তাহার কিংবা আর-কাহারো মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল,—"মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো।" গুঁড়ি একপাক ঘুরিতে না ঘুরিতেই মাখন তাহার গাম্ভীর্য গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞান-সমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফললাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল। মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপর গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙিয়া গেল।

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া, একটা অর্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের উপরে বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

এমন সময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্ধবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চক্রবর্তীদের বাড়ি কোথায়?"

বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, "ওই হোথা।" কিন্তু কোন্‌দিকে যে নির্দেশ করিল, কাহারও বুঝিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা?"

সে বলিল, "জানি নে।" বলিয়া পূর্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘা-বাগদি আসিয়া কহিল, "ফটিকদাদা, মা ডাকছে।"

ফটিক কহিল, "যাব না।"

বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল; ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, "আবার তুই মাখনকে মেরেছিস?"

ফটিক কহিল, "না, মারি নি।"

"ফের মিথ্যে কথা বলছিস্?"

"কখ্খনো মারি নি। মাখনকে জিজ্ঞাসা করো।"

মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল, "হাঁ, মেরেছে।"

তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় কষাইয়া দিয়া কহিল, "ফের মিথ্যে কথা!"

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুই-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চীৎকার করিয়া কহিলেন, "অ্যাঁ, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস!"

এমন সময়ে সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কী হচ্ছে তোমাদের!"

ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন, "ওমা, এ যে দাদা? তুমি কবে এলে?" বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই-একদিন পূর্বে বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে তাঁহার ভগিনী কহিলেন, "ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে।"

শুনিয়া বিশ্বম্ভর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কলকাতায় যাবি?"

ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "যাব।"

'কবে যাবে', 'কখন্ যাবে' করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল; উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হয় না।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্যবশত তাহার ছিপ ঘুড়ি লাটাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছিয়া প্রথমত মামীর সঙ্গে আলাপ হইল। মামী এই অনাবশ্যক পরিবারবৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না।

মামীর স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুর্গ্রহের মতো প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফটিকের সবচেয়ে বাজিত। মামী যদি দৈবাৎ তাহাকে কোনো-একটা কাজ করিতে বলিতেন, তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশি কাজ করিয়া ফেলিত, অবশেষে মামী যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন, "ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমার হাত দিতে হবে না। এখন তুমি নিজের কাজে মন দাওগে। একটু পড়োগে যাও।" —তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামীর এতটা যত্নবাহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেইসব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

একদিন অনেক সাহসে সে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"মামা, মার কাছে কবে যাব?" মামা বলিয়াছিলেন, "স্কুলের ছুটি হোক।" কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনো ঢের দেরি।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। মাস্টার প্রতিদিন

তাহাকে মারধোর করিতে আরম্ভ করিলেন। অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামীর কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কহিল, "বই হারিয়ে ফেলেছি।"

মামী অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, "বেশ করেছ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারি নে।"

ফটিক আর-কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল—সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে, এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল, নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথাব্যথা করিতে লাগিল এবং গা সির্‌সির্‌ করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল তাহার জ্বর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল, ব্যামো বাধাইলে তাহার মামীর প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামী এই ব্যামোটাকে যে কিরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবে, তাহা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্ভরবাবু পুলিসে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনো ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন পুলিসের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্ভরবাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাঙ্গে কাদা, মুখ চক্ষু লোহিতবর্ণ, থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বম্ভরবাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামী তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন কর্মভোগ? দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।"

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্ভরবাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল, "মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি?"

বিশ্বম্ভরবাবু রুমালে চোখ মুছিয়া সস্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া চারিদিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বম্ভরবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "ফটিক, তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।"

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। বিশ্বম্ভরবাবু স্তিমিতপ্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতিমুহূর্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসিদের মতো সুর করিয়া বলিতে লাগিল, "এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে—এ—এ—না।" কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

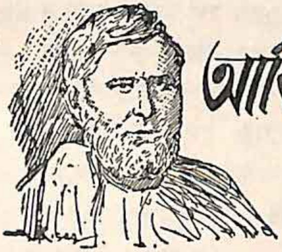
এমন সময় ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "ফটিক, সোনা, মানিক আমার!"

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, "অ্যাঁ।"

মা আবার ডাকিলেন, "ওরে ফটিক, বাপধন রে!"

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।"

(সংক্ষেপিত)



আর্কিমিদিসের আবিষ্কার

রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী

একটা চোঙায় বালি পুরিয়া তার তলে ছিদ্র করিলে ছিদ্র দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া বালি বাহির হইবে, কিন্তু চোঙার গায়ে পাশে ছিদ্র করিলে সে পথে বালি বাহির হইবে না; কিন্তু চোঙায় জল পুরিয়া তলায় বা পাশে যেখানে ছিদ্র কর না কেন, সেই পথে জলের প্রবাহ ছুটিবে। বালি কেবল চোঙার তলের উপর চাপ দেয়, আর জল তলেও চাপ দেয়, পাশেও চাপ দেয়। শুধু পাশে কেন, জল ঊর্ধ্বমুখেও চাপ দিতে পারে। গাড়ুতে কানায় কানায় জল পুরিলে দেখা যায়—উহার নলের মুখ হইতে ঊর্ধ্বমুখে জলের ফোয়ারা ছুটিয়াছে। নলের মুখটা গাড়ুর কানার নীচে থাকিলে এরূপ ঘটে। কানায় কানায় জলে ভরা কলসীর গলার নীচে—অর্থাৎ যেখানটাকে কলসীর কাঁধ বলা চলিতে পারে সেই কাঁধে—একটা ফুটা করিলে নীচের জল ঊর্ধ্বমুখে বাহির হয়। সে যাক্, ঊর্ধ্বমুখে চাপ পড়ে বলিয়াই ভিতরের জল বাহিরে ঊর্ধ্বমুখে ছুটিয়া থাকে। জলেরই ফোয়ারা হয়; বালির এরূপ ফোয়ারা হয় না। জল নিম্নমুখে, পার্শ্বমুখে, ঊর্ধ্বমুখে, সকল মুখেই চাপ দেয়। তরল পদার্থেরই এই স্বভাব, উহার চাপ সর্বতোমুখ। কঠিন পদার্থের চাপ কেবল নিম্নমুখ। জলের চাপ সর্বতোমুখ বটে তবে সর্বত্র পরিমাণে সমান নহে। জলের পিঠ সর্বদা সমতল থাকে; সেই পিঠের যত নীচে যাওয়া যায়, চাপের মাত্রা ততই বাড়িয়া যায়। ইহাও ঐ চোঙা হইতেই পরীক্ষা করিলে বুঝা যাইবে। চোঙার পাশে দুইটা ছিদ্র করো; একটা উচ্চে, একটা নিম্নে। দুই ছিদ্র দিয়াই জল বাহির হইবে, কিন্তু উপরের ছিদ্রপথে যে জল বাহির হইবে, তাহার বেগ অল্প, নীচের ছিদ্রের জলের বেগ অধিক। কেননা, যে জল নীচের ছিদ্র দিয়া বাহির হইতেছে, সে গভীর জল; উপরের ছিদ্রের জল তত গভীর জল নহে। জলের গভীরতা

যেখানে এক হাত, সেখানে যে চাপ, গভীরতা যেখানে দশ হাত, সেখানে চাপ ঠিক তাহার দশ গুণ,—পনেরো গুণও নহে, নয় গুণও নহে,—ঠিক দশ গুণ।

কতকগুলো চোঙায় বা পাত্রে জল ঢালিয়া যদি পরস্পর কোনোরূপে যোগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সবগুলিতেই জলের পিঠ ঠিক সমান উচুঁতে থাকে; একটায় উচ্চতা কম, অন্যটায় বেশি হয় না। গড়গড়ার নলের দুই প্রান্ত দুই হাতে ধরিয়া ঝুলাইয়া তাহার একমুখে জল ঢালিলে দেখা যাইবে, দুই ধারের নলে জলের পিঠ ঠিক সমান উচ্চে আছে। একটা প্রান্ত উঁচুতে, অন্য প্রান্ত নীচে, ধরিয়া নলকে জলপূর্ণ করিলে দেখা যাইবে, নিম্নস্থ মুখ দিয়া ঊর্ধ্বমুখে জলের ফোয়ারা বাহির হইতেছে; জল ঊর্ধ্বমুখে উঠিয়া অন্যমুখের জলতলের সমোচ্চ হইবার চেষ্টা করিতেছে। যেখানে যত ফোয়ারা আছে—নৈসর্গিক বা কৃত্রিম—সকলেরই মূল এইখানে। নিকটা-নিকটি কতকগুলি পুষ্করিণী বা ইঁদারা থাকিলে, সকলগুলিরই জলের পিঠ সমান উচ্চ থাকে; গরমিকালে একটার জল যেমন নামে, অন্যগুলিতেও জল তেমনি নামিয়া যায়। এখানে বুঝিতে হইবে, সচ্ছিদ্র মৃত্তিকামধ্য দিয়া জলের সঞ্চরণ ঘটিতেছে; পুকুরে পুকুরে ও কূপে কূপে মাটির নীচে যোগ রহিয়াছে। বড়ো শহরের নিকট পাহাড় থাকিলে পাহাড়ের উপরে জল ধরিয়া সেই জল নলযোগে শহরের লোকের বাড়ি বাড়ি সরবরাহ করা হয়।

কোনো ভারী জিনিস জলে ডুবাইলে তাহা লঘু বলিয়া বোধ হয়;—যেন তাহার ওজন কমিয়া যায়। তাহার অর্থ কী? সেই জিনিসের উপর চারিদিক,—চারিদিক কেন দশদিক—হইতে জলের চাপ পড়ে; আশ হইতে পাশ হইতে, নীচ হইতে উপর হইতে, চাপ পড়ে। আশপাশের জলের গভীরতা সমান, চাপও সমান; চাপে চাপে কাটাকাটি হইয়া যায়। কিন্তু উপরের জল জিনিসটাকে নীচে চাপে, নীচের জল উহাকে উপরে ঠেলে। উপরের জলে গভীরতা কম, চাপটাও কম; নীচে গভীরতা বেশি, ঠেলাটাও বেশি; মোটের উপর উপরের চাপ অপেক্ষা নীচের ঠেলা অধিক হাওয়ায় নীচের ঠেলারই প্রাবল্য ঘটে; দশদিকের জল চক্রান্ত করিয়া জিনিসটাকে মোটের উপর উপর মুখেই ঠেলা দেয়। তার জন্য উহার ভার অর্থাৎ নিম্নে যাইবার প্রবৃত্তি যেন কমিয়া যায়। সকল জিনিসেরই নিজের একটা ভার বা

ওজন আছে; এই ভারের দরুন সকল জিনিসই নীচে নামিতে চায়। জল কিন্তু চায় ঠেলিয়া তুলিতে। ভার বেশি, ঠেলা কম হইলে জিনিস ডুবে, ভার কম, ঠেলা বেশি হইলে জিনিস ভাসিয়া উঠে।

এক টুকরা শোলা হইতে একখানা প্রকাণ্ড জাহাজ পর্যন্ত জলে ভাসে। জলে ভাসিবার সময় জিনিসটার কিয়দংশ জলে ডুবিয়া থাকে, কিয়দংশ জলের উপর থাকে। নিমগ্ন অংশের পৃষ্ঠে আশপাশের জলের ও নীচের জলের চাপ পড়িতেছে। আশপাশের চাপ কাটাকাটি হইয়া যায়। নীচের জলের চাপ জিনিসটাকে ঊর্ধ্বমুখে ঠেলিয়া ধরিয়া থাকে। জিনিসটার ভার বা ওজন উহাকে নীচে নামাইবার চেষ্টা করিতেছে; জলের ঊর্ধ্বমুখ চাপ উহাকে উপরে তুলিবার চেষ্টা করিতেছে; এ ক্ষেত্রে যখন জিনিসটা স্থির আছে, নামিতেছে না, উঠিতেছেও না, তখন বুঝিতে হইবে, উহার ভারের পরিমাণ যত, জলের ঠেলার পরিমাণও ঠিক তত।

জিনিসটা ভাসিয়া আছে, উহার কিয়দংশ তখন জলে মগ্ন। খানিকটা জলকে স্বস্থান হইতে সরাইয়া জিনিসটার মগ্ন অংশ যেন সেই জলশূন্য জায়গাটুকু অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই মগ্ন অংশের আয়তন যত, যে জলটুকু অপসারিত হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে, তাহারও আয়তন তত। সেই জলটুকু যখন স্বস্থানে ছিল, তখন স্বস্থানে স্থির হইয়াই ছিল; উহার নিজের ভারে নিজে নিম্নগামী হইতে চাহিতেছিল, কিন্তু উহার নীচের জলের ঠেলা উহাকে নিম্নগামী হইতে দিতেছিল না; কাজেই উহা স্বস্থানেই স্থির ছিল। এখন সেই জল স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। অন্য জিনিসের কিয়দংশ আসিয়া সেই জায়গাটুকু অধিকার করিয়াছে ও নীচের জলের ঠেলা পাইয়া সেই স্থানে স্থির আছে। জলে আগে জলকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, এখন জলে সেই ভাসন্ত দ্রব্যটাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। উভয়ত্র ঠেলা সমান, অতএব উভয়ত্র ভারও সমান। যে জলটুকু স্থানচ্যুত হইয়াছে, তাহারও যে ভার যে ওজন, এখন যে জিনিস আসিয়া সেই জলের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহারও সেই ভার সেই ওজন। নতুবা একের স্থান অন্যে পূরণ করিয়া এমনি স্থিরভাবে থাকিতে পারিত না।

ভারী জিনিসকে জলে একবার ডুবাইয়া দিলে তাহার দশদিকের জলে

চক্রান্ত করিয়া তাহাকে ঊর্ধ্বমুখে ঠেলিয়া ধরে, এই ঠেলাটাও ঠিক স্থানচ্যুত জলের ওজনের সমান হয়। জলমগ্ন দ্রব্যের ভারের যে লাঘব দেখা যায়, সেই লাঘবের পরিমাণও এইটুকু। অপসারিত জলের যে ওজন, মগ্ন দ্রব্যের ভার ঠিক ততটুকুই কমিয়া যায়। যে দ্রব্যের ওজন ছিল পাঁচ সেরের ওজন, মনে করো জলে ডুবাইলে তাহার ওজন তিন সের পরিমাণে কমিয়া গেল; জলে ডুবিবার পূর্বে ছিল পাঁচ সের; জলে ডুবিয়া হইয়াছে দুই সের মাত্র। জলে ডুবিলে জিনিস এইরূপ হয়। গ্রীক-বৈজ্ঞানিক আর্কিমিদিস এই তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। গল্প আছে, এই তথ্য আবিষ্কার করিয়া তিনি আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিলেন। শাস্ত্রেও বলে, বিজ্ঞানই আনন্দ।

(সংক্ষেপিত)

('জগৎকথা' হইতে সংকলিত)

মানুষের জয়যাত্রা



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একদিন মানুষ ছিল বুনো, ঘোড়াও ছিল বনের জন্তু। মানুষ ছুটিতে পারিত না, ঘোড়া বাতাসের মতো ছুটিত। কী সুন্দর তাহার ভঙ্গী, কী অবাধ তাহার স্বাধীনতা। মানুষ চাহিয়া দেখিত, আর তাহার ঈর্ষা হইত। সে ভাবিত, 'ঐ রকম বিদ্যুৎগামী চারটে পা যদি আমার থাকিত তাহা হইলে দূরকে দূর মানিতাম না, দেখিতে দেখিতে দিগ্‌দিগন্ত জয় করিয়া আসিতাম।' ঘোড়ার সর্বাঙ্গে যে একটি ছুটিবার আনন্দ দ্রুত তালে নৃত্য করিত সেইটির প্রতি মানুষের মনে মনে ভারি একটা লোভ হইল।

কিন্তু মানুষ শুধু শুধু লোভ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নহে—'কী করিলে ঘোড়ার চারটে পা আমি পাইতে পারি' গাছের তলায় বসিয়া এই কথাই সে ভাবিতে লাগিল। এমন অদ্ভুত ভাবনাও মানুষ ছাড়া আর কেহ ভাবে না। 'আমি দুই-পা-ওয়ালা খাড়া জীব, আমার চার পায়ের সংস্থান কি কোনোমতে হইতে পারে। অতএব, চিরদিন আমি এক-এক পা ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিব আর ঘোড়া তড়্‌বড়্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিবে, এ বিধানের অন্যথা হইতেই পারে না।' কিন্তু মানুষের অশান্ত মন এ কথা কোনোমতেই মানিল না।

একদিন সে ফাঁস লাগাইয়া বনের ঘোড়াকে ধরিল। কেশর ধরিয়া তাহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিয়া নিজের দেহের সঙ্গে ঘোড়ার চার পা জুড়িয়া লইল। এই চারটে পা-কে সম্পূর্ণ নিজের বশ করিতে তাহার বহুদিন লাগিয়াছে। সে অনেক পড়িয়াছে, অনেক মরিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই দমে নাই। ঘোড়ার গতিবেগকে সে ডাকাতি করিয়া লইবেই, এই তাহার পণ। তাহারই জিত হইল। মন্দগামী মানুষ দ্রুতগমনকে বাঁধিয়া ফেলিয়া আপনার কাজে খাটাইতে লাগিল।

ডাঙায় চলিতে চলিতে মানুষ এক জায়গায় আসিয়া দেখিল, সম্মুখে তাহার সমুদ্র, আর তো এগোইবার জো নাই। নীল জল, তাহার তল কোথায়, তাহার কূল দেখা যায় না। আর, লক্ষ লক্ষ ঢেউ তর্জনী তুলিয়া ডাঙার মানুষদের শাসাইতেছে; বলিতেছে, 'এক পা যদি এগোও তবে দেখাইয়া দিব, এখানে তোমার জারিজুরি খাটিবে না।' মানুষ তীরে বসিয়া এই অকূল নিষেধের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু নিষেধের ভিতর দিয়া একটা মস্ত আহ্বানও আসিতেছে। তরঙ্গগুলা অট্টহাস্যে নৃত্য করিতেছে। দেখিলে মনে হয় লক্ষ লক্ষ ইস্কুলের ছেলে যেন ছুটি পাইয়াছে—চীৎকার করিয়া, মাতামাতি করিয়া, কিছুতেই তাহাদের আশ মিটিতেছে না; পৃথিবীটাকে তাহারা যেন ফুটবলের গোলার মতো লাথি ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া আকাশে উড়াইয়া দিতে চায়। বাধাহীন জলরাশির এই দিগন্তবিস্তৃত মুক্তিকেও মানুষ আপন করিতে চায়। ঢেউগুলার মতো করিয়াই দিগন্তকে লুঠ করিয়া লইবার জন্য মানুষের কামনা।

কিন্তু এমন অদ্ভুত সাধ মিটিবে কী করিয়া; এই তীরের রেখাটা পর্যন্ত মানুষের অধিকারের সীমা—তাহার সমস্ত ইচ্ছাটাকে এই দাঁড়ির কাছে আসিয়া শেষ করিতে হইবে। কিন্তু, মানুষের ইচ্ছাকে যেখানে শেষ করিতে চাওয়া যায় সেইখানেই সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কোনোমতেই সে বাধাকে চরম বলিয়া মানিতে চাহিল না।

অবশেষে একদিন বুনো ঘোড়াটার মতোই সমুদ্রের ফেনকেশর ধরিয়া মানুষ তাহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিল। ক্রুদ্ধ সাগর পিঠ নাড়া দিল; মানুষ কত ডুবিল, কত মরিল, তাহার সীমা নাই। অবশেষে একদিন মানুষ এই অবাধ্য সাগরকেও আপনার সঙ্গে জুড়িয়া লইল; তাহার এক কূল হইতে আর-এক কূল পর্যন্ত মানুষের পায়ের কাছে আসিয়া মাথা হেঁট করিয়া দিল।

('যাত্রা' নামক প্রবন্ধ হইতে সংকলিত)

কলিকাতা আক্রমণ

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

[সিরাজ ইংরেজদের কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণ করিতে নিষেধ করেন। ইংরেজরা নবাবের আদেশ গ্রাহ্য করিল না। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দের এক ফরমানে ইংরেজদিগকে এদেশে বাণিজ্য বিষয়ে যে সকল সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল, ইংরেজদের ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা তাহার যথেচ্ছ অপব্যবহার করিতে লাগিল। রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস নবাবের বিরাগভাজন হইয়া কলিকাতার ইংরেজদের শরণাপন্ন হন। নবাব তাঁহাকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিবার জন্য ইংরেজদের আদেশ দেন। ইংরেজরা নবাবের আদেশ গ্রাহ্য করিল না। এই সকল কারণে নবাব ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি দখল করিয়া কলিকাতা আক্রমণ করিতে সসৈন্যে অগ্রসর হন।]

৭ই জুন প্রাতঃকালে কলিকাতার ইংরাজ-সওদাগরেরা সংবাদ পাইলেন যে, কাশিমবাজার নবাবের হস্তগত হইয়াছে, স্বয়ং সিরাজদ্দৌলা সসৈন্যে কলিকাতা আক্রমণ করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন। সেই দিনই ঢাকা, বালেশ্বর, জগদীয়া প্রভৃতি মফঃস্বল কুঠির ইংরাজ-কর্মচারীদিগকে তহবিলপত্র কুক্ষিগত করিয়া নিরাপদ স্থানে সরিয়া পড়িবার জন্য তাড়াতাড়ি পত্র লেখা হইল। রোজার ড্রেক তখন কলিকাতার গভর্নর। তিনি বাহুবলে নগর রক্ষা করিবেন বলিয়া সেনাদল সংগ্রহ করিবার জন্য নগরের মধ্যে ঢোল পিটিয়া দিয়া, সবিশেষ উৎসাহের সঙ্গে কলিকাতাবাসী ইংরাজ, ফিরিঙ্গী, আরমানী পর্তুগীজ,—সকলকেই পরম সমাদরে সম্মিলিত করিয়া, রীতিমতো সমরকৌশল, শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

তৎকালে কলিকাতায় অল্প কয়েক সহস্র ইংরাজ বণিকের বসতি ছিল। তাঁহারা যেমন সংখ্যায় নগণ্য, সেইরূপ সমরকৌশলে নিতান্ত অশিক্ষিত। তাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে বিশেষ আড়ম্বর করা নিষ্প্রয়োজন। সিরাজদ্দৌলা তাহা জানিতেন। কিন্তু পাছে তাঁহার অনুপস্থিতিকালের অবসর পাইয়া কুচক্রীদল শওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসাইয়া দিয়া সর্বনাশ সাধন করে, এই ভয়ে যাঁহার যাঁহার প্রতি সন্দেহ সমধিক প্রবল, তাঁহাদের সকলকেই সঙ্গে লইয়া

যুদ্ধযাত্রা করিলেন,—নিতান্ত অনুগত কয়েকজন সেনানায়ক রাজধানী রক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইচ্ছা না থাকিলেও, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মীরজাফর, মানিকচাঁদ সকলকেই সসৈন্যে নবাবের অনুগমন করিতে হইল।

সিরাজদ্দৌলা যে এইরূপ কৌশলে রাজধানীর আপদাশঙ্কা নিবারণ করিয়া, মহাসমারোহে নিশ্চিন্তহৃদয়ে সসৈন্যে কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইতে সফলকাম হইবেন, ইংরাজদিগের ততদূর ধারণা ছিল না। ৭ই জুন প্রাতঃকালে এই সংবাদ কলিকাতার ইংরাজমহলে সবিশেষ হুলস্থূল বাধাইয়া দিল। আর সময় নাই; যাহা কিছু করিবার এখনই তাহা সম্পন্ন করা আবশ্যক; কিন্তু রণকুশল সেনাপতির অভাবে কোনো কার্যেরই শৃঙ্খলা হইতে পারিল না। তথাপি যতদূর সম্ভব, ইংরাজেরা প্রাণপণে আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন। বাগবাজারে পেরিং নামক যে নূতন দুর্গপ্রাকার নির্মিত হইয়াছিল, সেখানে রাশি রাশি আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জীভূত হইল; জলপথে নগরাক্রমণ করিবার আশঙ্কা আছে; তজ্জন্য বাগবাজারের খালের ধারে ভাগীরথীগর্ভে যুদ্ধজাহাজ সুরক্ষিত হইল; পনেরো শত ঠিকা সিপাহি নিযুক্ত করিয়া মহারাষ্ট্র খাতের ধারে ধারে স্থানে স্থানে সমাবেশ করা হইল; দুর্গপ্রাচীরের যথাসাধ্য সংস্কার-কার্য সুসম্পন্ন করিয়া তন্মধ্যে অন্নপান সঞ্চিত করা হইল; মাদ্রাজে সাহায্য-ভিক্ষার জন্য পত্র লেখা হইল এবং নগররক্ষার জন্য ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগের সহায়তালাভের প্রার্থনায় তাঁহাদের নিকট দূত প্রেরিত হইল।

ওলন্দাজেরা কর্তব্যনিষ্ঠ সরলস্বভাব নিরীহ বণিক; তাঁহারা গায়ে পড়িয়া নবাবের সঙ্গে কলহসৃষ্টি করিতে সম্মত হইলেন না। ফরাসীরা চিরদিনই কৌতুকপ্রিয়। তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন—"বৃটিশসিংহ যদি প্রাণভয়ে নিতান্তই জড়োসড়ো হইয়া থাকেন, তবে তিনি অবলীলাক্রমে চন্দননগরের ফরাসীদুর্গে পলায়ন করিতে পারেন; সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, আশ্রিতের প্রাণরক্ষার জন্য ফরাসী-বীরগণ জীবনবিসর্জন করিতে কাতর হইবে না।" এই নিদারুণ বিপৎসময়ে চিরশত্রু ফরাসী-বণিকের এরূপ মর্মভেদী পরিহাসবাক্যে ইংরাজেরা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বাহুবলে আত্মরক্ষার জন্য দলে দলে সমর-শিক্ষায় নিযুক্ত হইলেন।

জলপথে বহিঃশত্রুর আক্রমণ-নিবারণের জন্য কলিকাতার আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে, ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে, টানা নামক স্থানে, নবাবী আমলে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ সংস্থাপিত হইয়াছিল। সে দুর্গে ১৩টি কামান লইয়া ৫০ জন সিপাহি নদীমুখ রক্ষা করিত এবং বহুদিন শত্রুসেনার সন্ধান না পাইয়া সকলেই নিরুদ্বেগে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিত। ইংরাজেরা ১৩ই জুন প্রাতঃকালে চারিখানা যুদ্ধজাহাজ লইয়া সহসা এই ক্ষুদ্র দুর্গ আক্রমণ করিয়া, প্রচণ্ডপ্রতাপে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অকস্মাৎ বজ্রনিনাদে হতবুদ্ধি হইয়া, সিপাহি-সেনা হুগলী অভিমুখে পলায়ন করিল; টানার ক্ষুদ্র দুর্গপ্রাচীরে বৃটিশ-বিজয়-বৈজয়ন্তী সগৌরবে অঙ্গবিস্তার করিবামাত্র বৃটিশ-বাহিনী দুর্গপ্রাচীরের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি অকর্মণ্য করিয়া একে একে ভাগীরথীতে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল।

এই সংবাদে হুগলীর ফৌজদার স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, এতদিনে ইংরাজের সর্বনাশ হইল। একে সিরাজদ্দৌলা ইংরাজ-বিদ্বেষী, তাহাতে বারংবার অপমানিত হইয়াছেন; অতঃপর ইংরাজের এই ধৃষ্টতার পরিচয় পাইবামাত্র আর কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতে সম্মত হইবেন না। ফৌজদার তাড়াতাড়ি দুর্গের উদ্ধারকল্পে সিপাহি-সেনা প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন।

১৪ই জুন টানার দুর্গদ্বারে ইংরাজ-বাঙালীর শক্তিপরীক্ষা আরম্ভ হইল। দুই সহস্র সিপাহি-সেনা মুহুর্মুহু কামান-ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন করিয়া দৃঢ়পদে দুর্গদ্বারে সমবেত হইবামাত্র, ইংরাজ বীরপুরুষেরা "পৃষ্ঠপ্রদর্শন" করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করিলেন না। কিন্তু "পৃষ্ঠপ্রদর্শন" করিয়াও অনেকে নিস্তার পাইলেন না; সিপাহিরা জাহাজের উপর মুষলধারায় গুলিবর্ষণ করিয়া ইংরাজ সেনাদলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাঁহারা গোলাবারুদের যথেষ্ট অপব্যয় করিয়াও সিপাহিদিগকে দুর্গ হইতে তাড়িত করিতে সমর্থ হইলেন না। কলিকাতা হইতে কতকগুলি নূতন বীরপুরুষ আসিয়া ছত্রভঙ্গ ইংরাজ-সেনাকে উৎসাহিত করিয়া বীরকীর্তি-সংস্থাপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিলেন। যখন তাহাতেও সিপাহি-সেনা হটিল না, তখন ইংরাজেরা নিতান্ত ভগ্নমনোরথে, নোঙর তুলিয়া, জাহাজ খুলিয়া, ধীরে ধীরে কলিকাতাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন।

দেশীয় বণিকদিগের মধ্যে অনেকেই কলিকাতায় বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন। নগরাক্রমণকালে পাছে তাঁহাদের কোনোরূপ অনিষ্ট হয় সেইজন্য চরাধিপতি রাজা রামরামসিংহ গোপনে উমিচাঁদকে একখানি গুপ্তলিপি পাঠাইয়া দূরস্থানে সরিয়া পড়িবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া পাঠাইলেন। ইংরাজদিগের তীব্র তাড়নায় গুপ্তচরের নিকট হইতে সেই পত্রখানি ইংরাজদিগেরই হস্তগত হইল। তখন সকলেই তর্জন-গর্জন করিয়া উমিচাঁদকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য লোকলস্কর প্রেরণ করিতে লাগিলেন। উমিচাঁদ ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতে পারেন নাই; তাঁহাকে সহসা ইংরাজসেনা বন্দিবেশে রাজপথ দিয়া টানিয়া লইয়া চলিল; দেশের লোক হাহাকার করিয়া উঠিল।

উমিচাঁদের সংসারে তাঁহার কুটুম্ব হাজারিমল্ল কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি এইরূপ উৎপীড়নে আতঙ্কযুক্ত হইয়া, ধনরত্ন ও পরিবারবর্গ লইয়া অন্য স্থানে পলায়ন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইহা ইংরাজদিগের সহ্য হইল না। কাতারে কাতারে ইংরাজসেনা বীরদর্পে উমিচাঁদের বাটী অবরোধ করিবার জন্য ধাবিত হইতে লাগিল। উমিচাঁদের প্রভুভক্ত বিশ্বাসী জমাদার বৃদ্ধ জগন্নাথ সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়সন্তান। তিনি উমিচাঁদের বেতনভোগী বরকন্দাজ ও ভৃত্যবর্গ সমবেত করিয়া পুরীরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ফিরিঙ্গীরা আসিয়া সিংহদ্বারে হাতাহাতি আরম্ভ করিল; উভয়পক্ষেই শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইল; অবশেষে উমিচাঁদের বরকন্দাজগণ আর পারিয়া উঠিল না;—একে একে অনেকেই ধরাশায়ী হইতে লাগিল। মানুষের যাহা সাধ্য ছিল, তাহা শেষ হইয়া গেল। ফিরিঙ্গীসেনা মহাকলরবে অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন জগন্নাথের ক্ষত্রিয়শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। হতভাগ্য আর অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিতে পারিল না; ক্ষিপ্রহস্তে অন্তঃপুরদ্বারে চিতাকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া দিল; তাহার পর,—তাহার পর,—স্বহস্তে একে একে প্রভু-পরিবারের ত্রয়োদশটি মহিলামস্তক দেহবিচ্যুত করিয়া, সতী-শোণিত-পরিপ্লুত শাণিত খরসান আত্মবক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিয়া রুধিরকর্দমে লুটাইয়া পড়িল। ফিরিঙ্গীসেনা জমাদারকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া আসিল; কিন্তু আর পুরপ্রবেশ করিবার অবসর পাইল না; উমিচাঁদের ইন্দ্রভবন এইরূপে শ্মশানভস্মে

সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কেবল এই শোকসমাচার আমরণ কীর্তন করিবার জন্য হতভাগ্য বৃদ্ধ জমাদারের জীবনবায়ু দেহবহির্গত হইল না।

সিরাজদ্দৌলা মহাসমারোহে সসৈন্যে হুগলীতে আসিয়া পদার্পণ করিবামাত্র চারিদিকে সে সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে প্রচারিত হইয়া পড়িল। ভাগীরথী-বক্ষ বিদারিত করিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে যে শত শত সুসজ্জিত রণতরী হুগলীতে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার সহিত হুগলীর ফৌজদার আরও অনেকগুলি তরণী সংযোগ করিয়া দিয়া সিপাহি-সেনার পক্ষে অপর পারে উপনীত হইবার সুব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সিরাজদ্দৌলার আদেশে ওলন্দাজ এবং ফরাসী-বণিক রাজসন্দর্শনে সমবেত হইলেন; ইউরোপে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা কলিকাতা আক্রমণে সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন না। সিরাজদ্দৌলা তজ্জন্য কোনোরূপ পীড়াপীড়ি না করিয়া, ফরাসীদিগের নিকট বারুদ চাহিয়া লইয়া, কলিকাতাভি-মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কলিকাতার লোকে সংবাদ পাইয়া একেবারে জড়োসড়ো হইয়া উঠিল;—এত কলাকৌশল, এত সগর্ব আস্ফালন, এত রণকৌশল-শিক্ষাপ্রণালী, সকলই যেন সিরাজদ্দৌলার নামে সহসা অবসন্ন হইয়া পড়িল। নগরের মধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। ইংরাজ-অধিবাসিগণ যিনি যেখানে ছিলেন,—মুহূর্তের মধ্যে আপন আপন সুসজ্জিত বাসভবনের দিকে সাশ্রুনয়নে একবারমাত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া দুর্গাভ্যন্তরে পলায়ন করিতে লাগিলেন; দেশীয় বণিকগণ যিনি যে পথে সুবিধা পাইলেন, নগর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পড়িতে লাগিলেন; পথে-ঘাটে, নদীসৈকতে, বনান্তরালে, সকল স্থানেই মহাকলরবে নরনারী, বালকবালিকা, শত্রুমিত্র কাতারে কাতারে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সকলেই পলায়ন করিল, কিন্তু হায়! ফিরিঙ্গীদল বড়োই বিপন্ন হইয়া পড়িল। ইংরাজের অনুকরণ করিয়া, সাহেব সাজিয়া, দেশের লোকের সঙ্গে প্রণয়বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া এতদিন ফিরিঙ্গীদিগকে বিশেষ ক্লেশভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু আজ বিপদের দিনে তাহাদের সাহেবী পরিচ্ছদ বড়োই বিড়ম্বনার কারণ হইয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল যে, ফিরিঙ্গীরাই যথার্থ "ন মাতা ন পিতা ন চ বন্ধু।" কি বাঙালীদলে, কি

সাহেবমণ্ডলীতে, কোনো স্থানেই তাহারা আশ্রয়লাভ করিবার অবসর পাইল না। তখন সকলে মিলিয়া দুর্গদ্বারে সমবেত হইয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয়লাভ করিবার জন্য করুণক্রন্দনে পাষাণহৃদয় বিগলিত করিতে লাগিল। অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তাহাদিগকে দুর্গমধ্যে আশ্রয়দান করিতে হইল। ইংরাজদুর্গ স্বেচ্ছাচারের লীলাভূমি হইয়া উঠিল;—কেবল কোলাহল, কেবল আর্তনাদ, কেবল স্বার্থচিন্তা;—সকলেই বুঝিল যে, নগররক্ষা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে।

নবাবের বৃহদায়তন দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র যখন ভীমগর্জনে তাঁহার আগমন-বার্তা ঘোষণা করিতে লাগিল, ইংরাজেরা তখন নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া নবাবের মনস্তুষ্টিসাধনের জন্য কৌশলজাল বিস্তার করিতে ত্রুটি করিলেন না। অর্থ-প্রলোভনে সিরাজদ্দৌলাকে রাজধানীতে প্রত্যাগত করাইবার জন্য উৎকোচ উপঢৌকন লইয়া নানারূপ কাকুতি-মিনতি জানাইতেও কৃপণতা করিলেন না। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা কিছুতেই সংকল্পচ্যুত হইলেন না। যখন সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া গেল, তখন বিপদে পড়িয়া ইংরাজ-বীরপুরুষেরা নগররক্ষার জন্য আপন আপন সংকেতভূমিতে সমবেত হইতে লাগিলেন; বাহিরে নবাব-শিবিরে ঘন ঘন কামানগর্জন, ভিতরে ইংরাজমণ্ডলীতে ততোধিক তুমুল কোলাহল;—এইরূপে উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে, প্রতিমুহূর্তের পরাজয়চিন্তায় ইংরাজ-সেনা বিনিদ্র-নয়নে রজনীযাপন করিতে লাগিল।

যাহারা দুর্গরক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, হল্‌ওয়েল তাহাদের সংখ্যা নির্দেশ করিতে গিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, তন্মধ্যে ৬০ জনের অধিক ইউরোপীয় সেনা ও সেনানায়ক ছিল না;—এই ক্ষুদ্র সেনাদল যে ভীতিকম্পিত কলেবরে তুমুল কোলাহল তুলিবে, তাহাতে আর আশ্চর্যের কথা কী?

('সিরাজদ্দৌলা' হইতে সংকলিত)



সব্যসাচী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের দাবী'-র নায়ক সব্যসাচী বর্মা-প্রবেশের সময় গিরীশ মহাপাত্রের ছদ্মবেশে কিরূপে পুলিসকে ফাঁকি দিয়াছিলেন—সেই কৌতুককর ঘটনা এখানে বর্ণিত হইয়াছে।]

অপূর্ব ফিরিয়া দেখিল, সাধারণ ভদ্র বাঙালীর পোশাকে দাঁড়াইয়া তাহাদের পরিচিত নিমাইবাবু। ইনি বাঙলা দেশের একজন বড়ো পুলিস-কর্মচারী। অপূর্বর পিতা ইঁহার চাকরি করিয়া দেন, তিনিই ছিলেন ইঁহার মুরুব্বি। নিমাইবাবু তাঁহাকে দাদা বলিতেন, এবং সেই সূত্রে অপূর্বরা সকলেই ইঁহাকে নিমাইকাকা বলিয়া ডাকিত। স্বদেশী যুগে অপূর্ব যে ধরা পড়িয়া শাস্তি ভোগ করে নাই, সে অনেকটা ইঁহারই প্রসাদে। পথের মধ্যেই অপূর্ব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের চাকরির সংবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনি যে এদেশে?

নিমাইবাবু আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, বাবা, কচি ছেলে তুমি, তোমাকে এতটা দূরে ঘর-দোর মা-বোন ছেড়ে আসতে হয়েছে আর আমাকে হতে পারে না? পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া কহিলেন, আমার সময় নেই, কিন্তু তোমার তো অফিসে যাবার এখনও ঢের দেরি আছে। চলো না বাবা, পথে যেতে যেতে দুটো কথা শুনি। কতকাল যে তোমাদের খবর নিতে পারি নি তার ঠিক নেই। মা ভালো আছেন? দাদারা?

সকলেই ভালো আছেন জানাইয়া অপূর্ব প্রশ্ন করিল, আপনি এখন কোথায় যাবেন?

জাহাজঘাটে। চলো না আমার সঙ্গে

চলুন। আপনাকে কি আর কোথাও যেতে হবে?

নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, হতেও পারে। যে মহাপুরুষকে সংবর্ধনা করে নিয়ে যাবার জন্যে দেশ ছেড়ে এতদূর আসতে হয়েছে, তাঁর মর্জির উপরেই এখন সমস্ত নির্ভর করছে। তাঁর ফটোগ্রাফও আছে, বিবরণও দেওয়া আছে, কিন্তু এখানের পুলিসের বাবার সাধ্য নেই যে তাঁর গায়ে হাত দেয়। আমিই পারব কিনা তাই ভাবছি।

অপূর্ব মহাপুরুষের ইঙ্গিত বুঝিল। কৌতূহলী হইয়া কহিল, মহাপুরুষটি কে কাকাবাবু? যখন আপনি এসেছেন, তখন বাঙালী সন্দেহ নেই, —খুনী আসামী, না?

নিমাইবাবু কহিলেন, ঐটি বলতে পারব না বাবা। তিনি যে কী, এবং কী নয় একথা ঠিক কেউ জানে না। এঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো চার্জও নেই, অথচ যে চার্জ আছে তা আমাদের পিনাল কোডের কোহিনূর। এঁকে চোখে-চোখে রাখতে এত বড়ো গভর্নমেন্ট যেন হিমশিম খেয়ে গেল।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, পোলিটিক্যাল আসামী বুঝি?

নিমাইবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ওরে বাবা, পোলিটিক্যাল আসামী তো লোকে তোদেরও এক সময় বলত। কিন্তু সে বললে এঁর কিছুই বুঝায় না। ইনি হচ্ছেন রাজবিদ্রোহী! রাজার শত্রু! হাঁ, শত্রু বলবার লোক বটে! বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে যিনি এই ছেলেটির নাম রেখেছিলেন সব্যসাচী। মহাভারতের মতে নাকি তার দুটো হাতই সমানে চলত, কিন্তু প্রবলপ্রতাপান্বিত সরকার বাহাদুরের সুগুপ্ত ইতিহাসের মতে এই মানুষটির দশ ইন্দ্রিয়ই নাকি বাবা সমান বেগে চলে। বন্দুক-পিস্তলে এঁর অভ্রান্ত লক্ষ্য, পদ্মানদী সাঁতার কেটে পার হয়ে যান, বাধে না,—সম্প্রতি অনুমান এই যে চট্টগ্রামের পথে পাহাড় ডিঙিয়ে তিনি বর্মা মুলুকে পদার্পণ করেছেন। এখন ম্যান্ডেলে থেকে নদীপথে জাহাজে চড়ে রেঙ্গুনে আসবেন, কিংবা, রেলপথে ট্রেনে সওয়ার হয়ে শুভাগমন করছেন সঠিক সংবাদ নেই,—তবে তিনি যে রওনা হয়েছেন সে কথা ঠিক।

অপূর্ব উৎসাহ ও উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া কহিল, এতদিন কোথায় এবং কী করছিলেন ইনি? সব্যসাচী নাম তো কখনো শুনেছি মনে হচ্ছে না।

নিমাইবাবু সহাস্যে কহিলেন, ওরে বাবা, এই সব বড়ো লোকদের কি আর কেবল একটা নামে কাজ চলে? অর্জুনের মতো দেশে দেশে কত নামই হয়তো এঁর প্রচলিত আছে। সেকালে হয়তো শুনেও থাকবে এখন চিনতে পারছ না। আর, কী যে ইতিমধ্যে করছিলেন সম্যক্ ওয়াকিফহাল নেই। রাজ-শত্রুরা তো তাঁদের সমস্ত কাজকর্ম ঢাক পিটে করতে পছন্দ করেন না, তবে পুনায় এক দফা তিন মাস এবং সিঙ্গাপুরে আর এক দফা তিন বচ্ছর জেল খেটেছেন জানি। ছেলেটি দশ-বারোটা ভাষা এমন বলতে পারে যে বিদেশী লোকের পক্ষে চেনা ভার ইনি কোথাকার। জারমেনির জেনা না কোথায় ডাক্তারি পাস করেছে, ফ্রান্সে ইঞ্জিনিয়ারি পাস করেছে, বিলেতে আইন পাস করেছে, আমেরিকায় কী পাস করেছে জানি নে, তবে সেখানে ছিল যখন, তখন কিছু একটা করেই থাকবে,—এসব বোধ করি এর তাস-পাশা খেলার শামিল,—রিক্রিয়েশান,—কিন্তু, কিছুই কোনো কাজে এল না বাবা, এর সর্বাঙ্গের শিরা দিয়ে ভগবান এমনি আগুন জেবলে দিয়েছেন যে ওকে জেলেই দাও আর শূলেই দাও,—ঐ যে বললুম পঞ্চভূত ছাড়া আর আমাদের শান্তি স্বস্তি নেই! এদের না আছে দয়া-মায়া, না আছে ধর্ম-কর্ম, না আছে কোনো ঘর-দোর,—বাপ্‌রে বাপ্! আমরাও তো এদেশেরই মানুষ, কিন্তু এ ছেলে যে কোত্থেকে এসে বাঙলা মুলুকে জন্মাল তা ভেবেই পাওয়া যায় না!

অপূর্ব সহসা কথা কহিতে পারিল না,—শিরার মধ্যে দিয়া তাহারও যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলার পরে আস্তে আস্তে কহিল, এঁকে কি আজ আপনি অ্যারেস্ট করবেন?

নিমাইবাবু হাসিয়া বলিলেন, আগে তো পাই!

অপূর্ব কহিল, ধরুন, পেলেন।

না বাবা, অত সহজ বস্তু নয়। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস সে শেষ মুহূর্তে আর কোনো পথ দিয়ে কোথাও সরে গেছে।

আর যদি তিনি এসেই পড়েন তাহলে?

নিমাইবাবু একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, তাঁকে চোখে চোখে রাখবারই হুকুম আছে। দুদিন দেখি। ধরার চেয়ে ওয়াচ্ করার মূল্য বেশি, এই তো সম্প্রতি গভর্নমেন্টের ধারণা।

কথাটা অপূর্ব ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না, কারণ তিনি যাই হন তবুও পুলিস। তথাপি, তাহার মুখ দিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িল। কহিল, এঁর বয়স কত?

নিমাইবাবু কহিলেন, বেশি নয়। বোধ হয় ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যেই।

কী রকম দেখতে?

এইটিই ভারি আশ্চর্য বাবা। এত বড়ো একটা ভয়ংকর লোকের মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নেই, নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তাই চেনাও শক্ত, ধরাও শক্ত। আমাদের রিপোর্টের মধ্যে এই কথাটাই বিশেষ করে উল্লেখ করা আছে।

অপূর্ব কহিল, কিন্তু ধরা পড়ার ভয়েই তো এঁর হাঁটাপথে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে আসা?

নিমাইবাবু বলিলেন, না-ও হতে পারে। হয়তো কী একটা মতলব আছে, হয়তো পথটা একবার চিনে রাখতে চায়—কিছুই বলা যায় না অপূর্ব। এরা যে পথের পথিক, তাতে সহজ মানুষের সোজা হিসেবের সঙ্গে এদের হিসেব মেলে না,—আজ এরই ভুল কি আমাদেরই ভুল তার একটা পরীক্ষা হবে। এমনও হতে পারে সমস্ত ছুটোছুটিই আমাদের বৃথা।

অপূর্ব এবার হাসিয়া কহিল, তাই যেন হয় আমি ভগবানের কাছে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি কাকাবাবু!

নিমাইবাবু নিজেও হাসিলেন, বলিলেন, বোকা ছেলে, পুলিসের কাছে এ কথা কি বলতে আছে? তোমার বাসার নম্বরটা কত বললে? তিরিশ? কাল সকালে পারি তো একবার গিয়ে দেখে আসব। এই সামনের জেটিতেই বোধ হয় এদের স্টীমার লাগে,—আচ্ছা, তোমার আবার আফিসের সময় হয়ে এল,—নতুন চাকরি, দেরি হওয়া ভালো নয়। এই বলিয়া তিনি পাশ কাটাইয়া একটু দ্রুতপদে চলিবার উপক্রম করিতেই অপূর্ব কহিল, শুধু দেরি কেন, আজ আফিস কামাই হয়ে গেলেও আপনাকে ছাড়ছি নে। আমি চাই নে যে তিনি এসে আপনার হাতে পড়েন, কিন্তু সে দুর্ঘটনা যদি ঘটেই তবুও তো একবার চোখে দেখতে পাব। চলুন।...

জাহাজ জেটির গায়ে আসিয়া ভিড়িল, কাঠের সিঁড়ি নীচে আসিয়া লাগিল, নিমাইবাবু তাঁহার দলবল লইয়া পথের দু'ধারে সারি সারি দাঁড়াইলেন, কিন্তু

অপূর্ব নড়িল না। সে সেখানে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া একান্তমনে বলিতে লাগিল, মুহূর্ত পরে তোমার হাতে শৃঙ্খল পড়িবে, কৌতূহলী নরনারী তোমার লাঞ্ছনা ও অপমান চোখ মেলিয়া দেখিবে, তাহারা জানিতেও পারিবে না তাহাদের জন্য তুমি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আর তোমার থাকা চলিবে না।...সময় যে কত কাটিল সেদিকেও তাহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না, হঠাৎ নিমাইবাবুর কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল। তাহার তদ্গত বিহ্বল ভাব তিনি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য হইলেন, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করিলেন না, বলিলেন, যা ভয় করেছিলাম তাই! পালিয়েছে।

কী করে পালাল?

নিমাইবাবু কহিলেন, তাই যদি জানব তো সে কি পালায়? প্রায় শ' তিনেক যাত্রী, বিশ-পঁচিশটা সাহেব ফিরিঙ্গী, উড়ে, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী তাও শ' দেড়েক হবে, বাকি বর্মা—সে যে কার পোশাক পরে আর কার ভাষা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল তা দেবা ন জানন্তি—বুঝলে না বাবাজি—আমরা তো পুলিস। চেনবার জো নেই তিনি বিলেতের কি বাঙলার! কেবল জগদীশবাবু সন্দেহ করে জন ছয়েক বাঙালীকে থানায় টেনে নিয়ে গেছেন, একটা লোকের সঙ্গে চেহারার মিলও আছে মনে হয়, কিন্তু ওই মনে হওয়া পর্যন্তই—সে নয়। যাবে নাকি বাবা, একবার লোকটাকে চোখে দেখবে?

অপূর্বর বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল, কহিল, তাদের যদি মারধর করেন তো আমি যেতে চাই নে।

নিমাইবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, এতগুলো লোককে নিঃশব্দে ছেড়ে দিলাম আর এ বেচারারা বাঙালী বলেই শুধু বাঙালী হয়ে এদের প্রতি অত্যাচার করব? ওরে বাবা, বাইরে থেকে তোরা পুলিসকে যত মন্দ মনে করিস্, সবাই তা নয়। ভালো-মন্দ সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু মুখ বুজে যত দুঃখ আমাদের পোহাতে হয় তা যদি জানতে তো তোমার এই দারোগা কাকাবাবুটিকে অত ঘৃণা করতে পারতে না অপূর্ব!

অপূর্ব লজ্জিত হইয়া কহিল, আপনি কর্তব্য করতে এসেছেন, তাই বলে আপনাকে ঘৃণা কেন করব কাকাবাবু! এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া তাঁহার

পদ স্পর্শ করিয়া কপালে ঠেকাইল। নিমাইবাবু খুশী হইয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, হয়েছে, হয়েছে। চলো একটু শীঘ্র যাওয়া যাক, লোকগুলো ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সারা হচ্ছে, একটু পরীক্ষা করে ছেড়ে দেওয়া যাক। এই বলিয়া তিনি হাত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহির করিয়া আনিলেন।

পুলিস-স্টেশনে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল সুমুখের হল-ঘরে জন ছয়েক বাঙালী মোটঘাট লইয়া বসিয়া আছে, জগদীশবাবু ইতিমধ্যেই তাহাদের টিনের তোরঙ্গ ও ছোটো বড়ো পুঁটুলি খুলিয়া তদারক শুরু করিয়া দিয়াছেন। শুধু যে-লোকটির প্রতি তাঁহার অত্যন্ত সন্দেহ হইয়াছে তাহাকে আর একটা ঘরে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহারা সকলেই উত্তর-ব্রহ্মে বর্মা-অয়েল-কোম্পানীর তেলের খনির কারখানায় মিস্ত্রির কাজ করিতেছিল, সেখানের জলহাওয়া সহ্য না হওয়ায় চাকরির উদ্দেশ্যে রেঙ্গুনে চলিয়া আসিয়াছে। ইহাদের নাম ধাম ও বিবরণ লইয়া ও সঙ্গের জিনিসপত্রের পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল, পোলিটিক্যাল সাস্‌পেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে নিমাইবাবুর সম্মুখে হাজির করা হইল। লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল। বয়স ত্রিশ-বত্রিশের অধিক নয়, কিন্তু যেমন রোগা তেমনি দুর্বল। এইটুকু কাশির পরিশ্রমেই সে হাঁপাইতে লাগিল। মনে হয় না যে সংসারের মিয়াদ আর তাহার দীর্ঘদিন আছে, ভিতরের কী একটা দুরারোগ্য রোগে সমস্ত দেহটা যেন দ্রুতবেগে ক্ষয়ের দিকে ছুটিয়াছে। কেবল আশ্চর্য সেই রোগা মুখের অদ্ভুত দুটি চোখের দৃষ্টি। সে চোখ ছোটো কি বড়ো, টানা কি গোল, দীপ্ত কি প্রভাহীন এ সকল বিবরণ দিতে যাওয়াই বৃথা,—অত্যন্ত গভীর জলাশয়ের মতো কী যে তাহাতে আছে, ভয় হয় এখানে খেলা চলিবে না, সাবধানে দূরে দাঁড়ানোই প্রয়োজন। ইহারই কোন্ অতল তলে তাহার ক্ষীণ প্রাণশক্তিটুকু লুকানো আছে, মৃত্যুও সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস করে না।—কেবল এই জন্যই যেন সে আজও বাঁচিয়া আছে। অপূর্ব মুগ্ধ হইয়া সেই দিকে চাহিয়াছিল, সহসা নিমাইবাবু তাহার বেশভূষার বাহার ও পারিপাট্যের প্রতি অপূর্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া সহাস্যে কহিলেন, বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু শখ ষোলো আনাই বজায় আছে তা স্বীকার করতে হবে। কী বল অপূর্ব?

এতক্ষণে অপূর্ব তাহার পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া

হাসি গোপন করিল। তাহার মাথার সম্মুখদিকে বড়ো বড়ো চুল, কিন্তু ঘাড় ও কানের দিকে নাই বলিলেই চলে,—এমনি ছোটো করিয়া ছাঁটা। মাথায় চেরা সিঁথি,—অপর্যাপ্ত তৈলনিষিক্ত, কঠিন, রুগ্ন কেশ হইতে নিদারুণ নেবুর তেলের গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে। গায়ে জাপানী সিল্কের রামধনু রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবি, তাহার বুকপকেট হইতে বাঘ-আঁকা একটা রুমালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে, উত্তরীয়ের কোনো বালাই নাই। পরনে বিলাতী মিলের কালো মখমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ি, পায়ে সবুজ রঙের ফুল মোজা—হাঁটুর উপরে লাল ফিতা দিয়া বাঁধা, বার্নিশ-করা পাম্প-শু, তলাটা মজবুত ও টেকসই করিতে আগাগোড়া লোহার নাল বাঁধানো, হাতে একগাছি হরিণের শিঙের হাতল-দেওয়া বেতের ছড়ি,—কয়দিনের জাহাজের ধকলে সমস্তই নোংরা হইয়া উঠিয়াছে,—ইহার আপাদমস্তক অপূর্ব বার বার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, কাকাবাবু, এ লোকটিকে আপনি কোনো কথা জিজ্ঞেস না করেই ছেড়ে দিন, যাকে খুঁজছেন সে যে এ নয়, তার আমি জামিন হতে পারি।

নিমাইবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। অপূর্ব কহিল, আর যাই হোক, যাঁকে খুঁজছেন তাঁর কল্‌চরের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।

নিমাইবাবু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন, কহিলেন, তোমার নাম কী হে?

আজ্ঞে গিরীশ মহাপাত্র।

একদম মহাপাত্র! তুমিও তেলের খনিতেই কাজ করছিলে, না? এখন রেঙ্গুনেই থাকবে? তোমার বাক্স বিছানা তো খানাতল্লাশি হয়ে গেছে, দেখি তোমার ট্যাঁকে এবং পকেটে কী আছে?

তাহার ট্যাঁক হইতে একটা টাকা ও গন্ডা ছয়েক পয়সা বাহির হইল, পকেট হইতে একটা লোহার কম্পাস, মাপ করিবার কাঠের একটা ফুটরুল, কয়েকটা বিড়ি, একটা দেশলাই ও একটা গাঁজার কলিকা বাহির হইয়া পড়িল।

নিমাইবাবু কহিলেন, তুমি গাঁজা খাও?

লোকটি অসংকোচে জবাব দিল, আজ্ঞে না।

তবে এ বস্তুটি পকেটে কেন?

আজ্ঞে, পথে কুড়িয়ে পেলাম, যদি কারও কাজে লাগে তাই তুলে রেখেছি।

জগদীশবাবু এই সময়ে ঘরে ঢুকিতে নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, দেখো

জগদীশ, কিরূপ সদাশয় ব্যক্তি ইনি। যদি কারও কাজে লাগে তাই গাঁজার কলকেটি কুড়িয়ে পকেটে রেখেছেন। দেখি বাবা তোমার হাতটি? এই বলিয়া সেই প্রবীণ, সুদক্ষ পুলিস-কর্মচারী মহাপাত্রের ডানহাতের অঙ্গুষ্ঠটি তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল পর্যবেক্ষণ করিয়া সহাস্যে কহিলেন, অনেক গাঁজা তৈরির চিহ্ন এইখানে বিদ্যমান বাবা, বললেই পারতে খাই। কিন্তু ক'দিনই বা বাঁচবে,—এই তো তোমার দেহ,—আর খেয়ো না। বুড়োমানুষের কথাটা শুনো।

মহাপাত্র মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল, আজ্ঞে না মাইরি খাই নে। তবে ইয়ার বন্ধু কেউ তৈরি করে দিতে বললে দিই,—এই মাত্র! নইলে নিজে খাই নে।

জগদীশবাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, দয়ার সাগর! পরকে সেজে দিই, নিজে খাই নে! মিথ্যেবাদী কোথাকার!

অপূর্ব কহিল, বেলা হয়ে গেল, আমি এখন তবে চললুম কাকাবাবু।

নিমাইবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার মহাপাত্র। কী বল জগদীশ, পারে তো? জগদীশ সম্মতি জানাইলে কহিলেন, কিন্তু নিশ্চয় কিছুই বলা যায় না ভায়া, আমার মনে হয় এ শহরে আরও কিছুদিন নজর রাখা দরকার। রাত্রের মেল ট্রেনটার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো, সে যে বর্মায় এসেছে এ খবর সত্য।

জগদীশ কহিলেন, তা হতে পারে, কিন্তু এই জানোয়ারটাকে ওয়াচ্ করবার দরকার নেই বড়োবাবু। নেবুর তেলের গন্ধে ব্যাটা থানাসুদ্ধ লোকের মাথা ধরিয়ে দিলে! বড়োবাবু হাসিতে লাগিলেন। অপূর্ব পুলিস-স্টেশন হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং প্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মহাপাত্র তাহার ভাঙা টিনের তোরঙ্গ ও চাটাই-জড়ানো ময়লা বিছানার বাণ্ডিল বগলে চাপিয়া ধীর মন্থর পদে উত্তর দিকের রাস্তা ধরিয়া সোজা প্রস্থান করিল।

বাঙ্গলার সংস্কৃতি

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালী ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের জাতিসকল হইতে পৃথক এবং স্বতন্ত্র, বাঙালীর একটা নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে।

বাংলার উপাসনাপদ্ধতি, কর্মপদ্ধতি, সাহিত্য, ভাষা এবং জাতি ও কুল-পরিচয় সম্বন্ধে, ইংরেজী যুগে ইংরেজীনবীশ পণ্ডিতগণের দ্বারা যথারীতি আলোচনা হয় নাই, তাই ইংরেজীনবীশ বাঙালী স্বদেশের ও স্বজাতির প্রকৃত পরিচয় রাখেন না।

বাঙালীর আগমনী বাঙালীর নিজস্ব; আগমনীগান ভারতবর্ষের আর কোনো প্রদেশে নাই, আর কোনো জাতি অমন গান করে নাই, গান করিতে জানেও না। তাই বাংলা দেশেই শ্যাম-শ্যামার সমন্বয়-সাধন অপূর্বভাবে হইয়াছিল। এই সমন্বয়ের মহাকবি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ; তাঁহার রচিত 'কালীকীর্তন' এই সমন্বয়ের অপূর্ব পরিচায়ক। বাংলা দেশেই প্রেমের ধর্মের প্রথম বিকাশ হয়।

পূর্বে কেবল মিথিলায় ন্যায়ের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত, মিথিলার পণ্ডিতগণ বাঙালী ছাত্রদের পুঁথি লিখিয়া আনিতে দিতেন না। তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রকে মিথিলার একচেটিয়া করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাংলার কানা ভট্ট শিরোমণি রঘুনাথ মেধার এতই উন্নতিসাধন করিলেন যে, তিনি ক্রমে শ্রুতিধর হইয়া উঠিলেন। তিনি মিথিলায় যাইয়া ন্যায়শাস্ত্র যথারীতি অধ্যয়ন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল পুঁথি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। দেশে আসিয়া একচক্ষু রঘুনাথ তাবৎ ন্যায়গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব মনীষাপ্রভাবে নব্য ন্যায়ের উদ্ভাবনা করিলেন। ফলে, মিথিলার একচেটিয়া চূর্ণ হইল, নবদ্বীপ নব্য এবং পুরাতন ন্যায়ের পঠন-পাঠনের কেন্দ্রস্বরূপ হইল। ইহাই বাঙালীর বিশিষ্টতার পরিচায়ক। বাঙালী ন্যায়ের এই অভ্যুদয়ধারা চারিশত বর্ষকাল অব্যাহত

রাখিতে পারিয়াছিলেন, নবদ্বীপকে নব্য ন্যায়ের অদ্বিতীয় কেন্দ্র করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে, মথুরায়, নাথদ্বারায় হরিকীর্তন শুনিয়াছি, ভজন শুনিয়াছি। এই সকল হিন্দুস্থানী ভজনে ও কীর্তনে শ্বপচাদি অস্পৃশ্য জাতিসকল গণ্ডীর বাহিরে স্থান পাইয়া থাকে। বাংলায় হরিসংকীর্তনে সে বাধা নাই, উচ্চ নীচ সকল জাতি সমান ভাবে কীর্তন-আনন্দ উপভোগ করিতে পারে; কীর্তনের ক্ষেত্রে শ্বপচাদির স্পর্শে বাঙালীর জাতি যায় না। কেবল এইটুকু নহে, সেই কীর্তনক্ষেত্রে সকল জাতির কীর্তনীয়ার পদরজের উপরে সোপবীত ব্রাহ্মণও ভাবাবেশে গড়াগড়ি দিয়া থাকেন। সেই কীর্তনমণ্ডলীর উপরে হরির লুটের বাতাসা ছড়াইয়া দিলে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সবাই তাহা কুড়াইয়া লইয়া মুখে দেয়। এতটা বাঙালী ছাড়া আর কোনো প্রদেশের বৈষ্ণব করিতে পারে নাই।

দীপংকর শ্রীজ্ঞান বাঙালীর ব্যক্তিত্বের একজন প্রধান সহায়ক। দীপংকর ভুটানে, তিব্বতে, চীনে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। বাংলার বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পূর্ব-এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। নেপালে বাঙালীর কীর্তির অনেক পুঁথিপত্র আছে। ছিল দিন—যখন বাঙালী বৈবাহিক সূত্রে তিব্বত, চীন, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশের সহিত সংবদ্ধ ছিল; ছিল দিন—যখন বাংলায় অসংখ্য বিদেশীয় পণ্ডিত আসিয়া বাস করিত।

বাংলার প্রথম ও মধ্য যুগের সাহিত্যেও একটা অপূর্বত্ব আছে। কবিকঙ্কণ, ঘনরাম প্রভৃতি সকল বড়ো কবিই ব্রাহ্মণ; পরন্তু তাঁহাদের লিখিত সকল মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নহে। গন্ধবণিক, সদ্‌গোপ, কৈবর্ত, গোড়ো গোয়ালা প্রভৃতি জাতীয় পুরুষ সকলই এই সকল কাব্যের নায়ক। ভারতচন্দ্রের পূর্বকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণ-লিখিত সকল মহাকাব্যে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের লেশ মাত্র নাই। চণ্ডীর ঘটস্থাপন ফুল্লরা নিজেই করিত, তজ্জন্য ব্রাহ্মণ ডাকিতে হইত না। কালকেতু, পুষ্পকেতু, ইছাই ঘোষ, লাউসেন, ভীম, ধনপতিপ্রমুখ নায়কগণ কোন্ জাতীয় ছিলেন? ইঁহারা যদি মহাকাব্যের নায়ক হইতে পারেন, তবে তাঁহাদিগকে অস্পৃশ্য বলি কোন্ হিসাবে?

এই সঙ্গে বাঙালীর ভাষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। বাংলা ভাষা

বাঙালীকে অপূর্ব বিশিষ্টতা দিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বাঙালী জাতির ইতিহাস লুকানো আছে। কুলজী গ্রন্থসকল সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ছাড়া বাংলার সংগীত-সাহিত্যও অপূর্ব এবং অনন্যসাধারণ। কবির গান, পাঁচালীর গান, শ্যামাবিষয়ক গান, কীর্তন, গাথা প্রভৃতি কত রকমের সংগীত-সাহিত্য ছিল বা আছে, তাহাদের শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ এবং সে সকল হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ এখনও কেহ করে নাই। অথচ বাঙালীর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ঘটনার উল্লেখ এই সকল গানে ও ছড়ায় নিবন্ধ আছে।

কত আর উল্লেখ করিয়া বলিব! বাঙালীর বিশিষ্টতা এবং ব্যক্তিত্ব সমাজ-শরীরের সর্বাবয়বে, শিল্পকলায়, গানে-নাচে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে, চিকিৎসা-পদ্ধতিতে, ঔষধ-নির্মাণে, নৌকা-প্রস্তুতিতে, কথকতায়-ব্যাখ্যায়, বয়নশিল্পে, তসর-গরদের বসন-প্রস্তুতিতে, গজদন্তের কারুকার্যে, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকারে, —সভ্য জাতির সকল ব্যসন-বিলাসে যেন সদাই স্পষ্টীকৃত হইয়া আছে।

বাংলার বাদ্যভাণ্ডের মধ্যে খুব বিশিষ্টতা প্রকট হইয়া আছে; বাংলার কবিওয়ালাদের ঢোল বাজানো অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ। এমন ভাবে ঢোল বাজাইতে ভারতবর্ষের আর কোনো জাতি পারে না। বাঙালীর গৃহনির্মাণ-পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। এমন ঘর ছাইতে ভারতবর্ষের, বুঝি বা পৃথিবীর আর কোনো জাতিতে পারে না। বাংলার আটচালা ও চণ্ডীমণ্ডপসকল সত্যই বিদেশীয়ের বিস্ময় উৎপাদন করিত; তেমনটি পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না—নাইও।

বাংলার 'পঙ্খের কাজ' বাঙালীর নিজস্ব; উহা বাংলার বাহিরে ছিল না—নাইও। এখন সে 'পঙ্খশিল্পে'র নমুনা গভর্নমেন্ট হাউসের গোটাকয়েক স্তম্ভে বিদ্যমান রহিয়াছে। এমন কি, বাংলার জনার্দন, বিশ্বম্ভর, জনমেজয় প্রভৃতি কর্মকারগণ যেমন তোপ কামান তৈয়ার করিতে পারিত, দিল্লীর কারিগরে তেমনটি পারিত না; জাহান-কোষা, দল-মাদল, কালে খাঁ প্রভৃতি কামান এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

বাঙালীর নৌশিল্প সত্যই অপরাজেয় ছিল। এমন নৌকা বানাইতে, জাল বুনিতে ভারতের আর কোনো জাতি পারিত না। বাংলার "ষাট বৈঠার ছিপে" চড়িয়া মীর কাসেম এক রাত্রে গোদাগিরি হইতে মুঙ্গেরে গিয়াছিলেন।

বাংলার আর একটা শিল্প ছিল কুসুমশিল্প। নানা পুষ্পের আভরণ ও অলংকার বাঙালী যেমন তৈয়ার করিতে পারিত, এমন আর কোনো জাতি পারিত না। আওরঙ্গজেব-পুত্র যুবরাজ মহম্মদ পিতাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—"কী আর মণিমুক্তা, চুনি-পান্নার লোভ দেখাও পিতঃ, বাংলার কুসুমাভরণ দিল্লীর জড়োয়া অলংকার-সকলকে হেলায় পরাজয় করে। এমনটি তুমি দেখ নাই।" সে শিল্প লোপ পাইয়াছে।

আসল কথাটি কী জান, বাঙালী আর্যাবর্তের আর্যগণ হইতে একটা সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। বৈদিক যুগের সময় হইতে বাংলায় এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ও মনুষ্যসমাজ বিদ্যমান ছিল।

স্বীকার করি বটে যে, বাঙালী আর্যাবর্ত হইতে আর্যগণের নিকট হইতে অনেক তথ্য, অনেক সিদ্ধান্ত, অনেক বিদ্যা সংগ্রহ করিয়াছিল; কিন্তু সে সকলকে বাঙালীর মনীষা যেন বাংলার কোমল, পেলব পলিমাটির আবরণ দিয়া এতই মধুর, এতই স্নিগ্ধ, এমনই রসাল করিয়াছিল যে, পরে উহা আর্যাবর্ত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল।

বাংলায় জৈন ধর্মের প্রথম বিকাশ হইয়াছিল, এমন কথা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। মহাবীর রাজমহলের কাছে কোনো গ্রামে ভূমিষ্ঠ হইয়া, জীবনের অর্ধেকটা কাল বর্ধমান-বিভাগে বা রাঢ়দেশে কাটাইয়াছিলেন; এই জৈন ধর্ম বাঙালীর বিশিষ্টতার পুষ্টিসাধনের পক্ষে অনেকটা সহায়তা করিয়াছিল।

গ্রীক শিবিরে চন্দ্রগুপ্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়



স্থান—সিন্ধু-নদতট; দূরে গ্রীক জাহাজশ্রেণী। কাল—সন্ধ্যা।

[নদতটে শিবির-সম্মুখে সেকেন্দার ও সেলুকস অস্তগামী সূর্যের দিকে চাহিয়া ছিলেন। হেলেন সেলুকসের হস্ত ধরিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান। সূর্যরশ্মি তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল।]

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস! কী বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়; আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এ আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি।

সেলুকস। সত্য সম্রাট।

সেকেন্দার। কোথাও দেখি, তালীবন গর্বভরে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বিরাট বন স্নেহচ্ছায়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে; কোথাও মদমত্ত মাতঙ্গ জঙ্গমপর্বতসম মন্থরগমনে চলেছে; আর সবার উপরে এক সৌম্য গৌর, দীর্ঘকান্তি জাতি এই দেশ শাসন করছে। তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস। এ শৌর্য পরাজয় করে' আনন্দ আছে। পুরুকে বন্দী করে' আনি যখন—সে কি বললে জান?

সেলুকস। কী সম্রাট?

সেকেন্দার। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার কাছে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর?'—সে নির্ভীক নিষ্কম্পস্বরে উত্তর দিল—'রাজার প্রতি রাজার

আচরণ!' চমকিত হলাম! ভাবলাম—এ একটা জাতি বটে! আমি তৎক্ষণাৎ তাকে তার রাজ্য প্রত্যর্পণ করলাম।

সেলুকস। সম্রাট মহানুভব।

সেকেন্দার। মহানুভব! তার পরে তার সঙ্গে অন্যরূপ ব্যবহার সম্ভব? মহৎ কিছু দেখলেই একটা উল্লাস আসে। আর আমি এখানে রাজ্য স্থাপন করতে আসি নাই। আমি এসেছি শৌখীন দিগ্বিজয়ে। জগতে একটা কীর্তি রেখে যেতে চাই।

সেলুকস। তবে এ দিগ্বিজয় অসম্পূর্ণ রেখে যাচ্ছেন কেন সম্রাট?

সেকেন্দার। সে দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ করতে হ'লে নূতন গ্রীক সৈন্য চাই।—কী আশ্চর্য সেনাপতি! দূর ম্যাসিডন থেকে রাজ্য, জনপদ তৃণসম পদতলে দলিত ক'রে চলে' এসেছি। ঝঞ্ঝার মতো এসে মহাশত্রুসৈন্য ধূমরাশির মতো উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু বাধা পেলাম প্রথম—সেই শতদ্রুতীরে।

[চন্দ্রগুপ্তকে ধরিয়া আন্টিগোনাসের প্রবেশ]

সেকেন্দার। কী সংবাদ আণ্টিগোনাস্—এ কে?

আণ্টিগোনাস্। গুপ্তচর।

সেলুকস। সে কি!

সেকেন্দার। গুপ্তচর!

আণ্টিগোনাস্। আমি দেখলাম যে এক শিবিরের পাশে বসে' নির্জনে শুষ্ক তালপত্রে কী লিখছিল। আমি দেখতে চাইলাম—পত্রখানি দেখাল! পড়তে পারলাম না।—তাই সম্রাটের কাছে নিয়ে এসেছি।

সেকেন্দার। কী লিখছিলে যুবক! সত্য বলো।

চন্দ্রগুপ্ত। সত্য বলব।—রাজাধিরাজ! ভারতবাসী মিথ্যাকথা বলতে এখনও শিখে নাই।

সেকেন্দার। (একবার সেলুকসের প্রতি চাহিলেন, পরে চন্দ্রগুপ্তকে কহিলেন) উত্তম। বলো কী লিখছিলে।

চন্দ্রগুপ্ত। আমি সম্রাটের বাহিনীচালনা, ব্যূহ-রচনা-প্রণালী, সামরিক নিয়ম এই সব মাসাবধিকাল ধ'রে শিখছিলাম।

সেকেন্দার। কার কাছে?

চন্দ্রগুপ্ত। এই সেনাপতির কাছে।

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস?

সেলুকস। সত্য।

সেকেন্দার। (চন্দ্রগুপ্তকে) তারপর?

চন্দ্রগুপ্ত। তারপর গ্রীক সৈন্য কাল এস্থান পরিত্যাগ করে' যাবে শুনে, আমি যা শিখেছি তা এই পত্রে লিখে' নিচ্ছিলাম।

সেকেন্দার। কী অভিপ্রায়ে?

চন্দ্রগুপ্ত। সেকেন্দার শাহ্‌র সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য নহে।

সেকেন্দার। তবে—

চন্দ্রগুপ্ত। তবে শুনুন সম্রাট। আমি মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত। আমার পিতার নাম মহাপদ্ম। আমার বৈমাত্রেয় ভাই নন্দ সিংহাসন অধিকার করে' আমায় নির্বাসিত করেছে। আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি।

সেকেন্দার। তারপর!

চন্দ্রগুপ্ত। তারপর শুনলাম ম্যাসিডন-ভূপতির অদ্ভুত বিজয়বার্তা! অর্ধেক এশিয়া পদতলে দলিত করে', নদনদী গিরি দুর্বার বিক্রমে অতিক্রম করে', শুনলাম তিনি ভারতবর্ষে এসে আর্যকুলরবি পুরুকে পরাজিত করেছেন। হে সম্রাট! আমার ইচ্ছা হ'ল যে দেখে আসি—কী সে পরাক্রম, যার ভ্রূকুটি দেখে, সমস্ত এশিয়া তার পদতলে লুটিয়ে পড়ে; তাই এখানে এসে সেনাপতির কাছে শিক্ষা করছিলাম। আমার ইচ্ছা শুধু আমার হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করা। এই মাত্র।

[সেকেন্দার সেলুকসের পানে চাহিয়া রহিলেন]

সেলুকস। আমি এরূপ বুঝি নাই। যুবকের চেহারা, কথাবার্তা আমার মিষ্ট লাগত। আমি সরলভাবে গ্রীক সামরিক প্রথা সম্বন্ধে এর সঙ্গে আলোচনা করতাম। বুঝি নাই যে এ বিশ্বাসঘাতক।

আণ্টিগোনাস্‌। কে বিশ্বাসঘাতক?

সেলুকস। এই যুবক।

আণ্টিগোনাস্। এই যুবক, না তুমি?

সেলুকস। আণ্টিগোনাস্! আমার বয়স না মান, পদবী মেনে চলো।

আণ্টিগোনাস্। জানি, তুমি গ্রীকসেনাপতি, তা সত্ত্বেও তুমি বিশ্বাসঘাতক।

সেলুকস। আণ্টিগোনাস্! (তরবারি বাহির করিলেন)

[আন্টিগোনাস্ ক্ষিপ্রতর হস্তে তরবারি বাহির করিয়া সেলুকসের শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি ক্ষেপণ করিলেন। ততোধিক ক্ষিপ্রহস্তে চন্দ্রগুপ্ত নিজ তরবারি বাহির করিয়া সে আঘাত নিবারণ করিলেন। আন্টিগোনাস্ তাঁহাকে ছাড়িয়া চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করিলেন।]

সেকেন্দার। নিরস্ত হও।

[সেই মুহূর্তেই আণ্টিগোনাসের তরবারি চন্দ্রগুপ্তের তরবারির আঘাতে ভূপতিত হইল]

সেকেন্দার। আণ্টিগোনাস্!

[আণ্টিগোনাস্ লজ্জায় শির অবনত করিলেন]

সেকেন্দার। আণ্টিগোনাস্! তোমার এই ঔদ্ধত্যের জন্য তোমায় আমার সাম্রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলাম। একজন সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের এতদূর স্পর্ধা! [আণ্টিগোনাসের প্রস্থান]

সেকেন্দার। আর সেলুকস! তোমার অপরাধ তত নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে স্মরণ রেখো যে, গ্রীক সম্রাটের সম্মুখে চক্ষু রক্তবর্ণ করা গ্রীক সেনাপতির শোভা পায় না,—আর যুবক!

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট!

সেকেন্দার। তোমায় যদি বন্দী করি।

চন্দ্রগুপ্ত। কী অপরাধে সম্রাট?

সেকেন্দার। আমার শিবিরে তুমি শত্রুর গুপ্তচর হ'য়ে প্রবেশ করেছ, এই অপরাধে।

চন্দ্রগুপ্ত। এই অপরাধে! ভেবেছিলাম যে সেকেন্দার শাহ্ বীর, দেখছি তিনি ভীরু। এক গৃহহীন নিরাশ্রয় হিন্দু রাজপুত্র ছাত্রহিসাবে তাঁর

কাছে উপস্থিত, তাতেই তিনি ত্রস্ত। সেকেন্দার শাহ্ এত কাপুরুষ, তা ভাবি নাই।

সেকেন্দার। সেলুকস! বন্দী করো।

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট! আমায় বধ না করে' বন্দী করতে পারবেন না।

সেকেন্দার। (সোল্লাসে) চমৎকার!—যাও বীর! তোমায় বন্দী করব না! আমি পরীক্ষা করছিলাম মাত্র। নির্ভয়ে তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও। আর আমি এক ভবিষ্যদ্বাণী করি মনে রেখো! তুমি হৃতরাজ্য উদ্ধার করবে। তুমি দুর্জয় দিগ্বিজয়ী হবে—যাও বীর! মুক্ত তুমি।

('চন্দ্রগুপ্ত' নাটক হইতে সংকলিত)

টাকার কথা

অনাথগোপাল সেন

মানবসভ্যতার আদিতে মানুষ যখন পশুর ন্যায় বনে-জঙ্গলে বিচরণ করিত তখন তাহার অর্থের প্রয়োজন হয় নাই, অর্থের জন্মও তখন হয় নাই। তারপর যখন সে আস্তে আস্তে জমি চাষ করিতে শিখিল, তীর-ধনু তৈয়ারি করিয়া আত্মরক্ষা ও আহারের জন্য পশুপক্ষী শিকার করিতে শুরু করিল, চকমকি ঠুকিয়া আগুন জ্বালিয়া মোটা রকমের কিঞ্চিৎ রন্ধনের ব্যবস্থাও করিয়া ফেলিল, তখনও তার টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয় নাই। কারণ যদিও "আমার ঘর, আমার জমি, আমার গাভী, আমার পরিবার" এই স্বত্ব-জ্ঞানের সবেমাত্র উন্মেষ হইয়াছে, তথাপি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ সমাজ-জীবনে তখন পর্যন্ত কর্ম-বিভাগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় নাই, সুতরাং পণ্য-বিনিময়ের আবশ্যকতাও ঘটে নাই। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা প্রত্যেককে নিজ পরিবারের গন্ডীর মধ্যে নিজ হাতেই করিয়া লইতে হইত।

তার পরের স্তরে আমরা কর্ম-বিভাগের প্রাথমিক সূচনা দেখিতে পাই এবং সঙ্গে সঙ্গে পণ্য-বিনিময়ের প্রয়োজনও আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু তখনো অর্থরূপ দালালের আবির্ভাব ঘটে নাই। কারণ পণ্যের শ্রেণী ও সংখ্যা এত সামান্য ছিল এবং পল্লী-সমাজ এত ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ ছিল যে সেখানে পণ্য-বিনিময়ের সহায়তা করিবার জন্য অর্থের আবশ্যকতা হয় নাই—পণ্যের সঙ্গে পণ্যের বিনিময়ে কাজ চলিয়া যাইত। চাষী, মজুর, ধোপা, নাপিত, কুমার, ছুতার, জেলে, জোলা এই নিয়া ছিল একটা পল্লী-সমাজ। ইহারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে জানিত এবং নিজ নিজ শ্রম বা পণ্যের বিনিময়ে প্রতিবেশীর নিকট হইতে অন্য প্রয়োজনীয় পণ্য সব সংগ্রহ করিয়া লইত; ইহার নামই বার্টার। কিন্তু পল্লী-জীবনের ক্রমোন্নতি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ বিনিময়ে অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। কারণ সব জিনিস সমান মূল্যের নয় এবং মূল্যের তারতম্যের জন্য সব জিনিস ভাগ করাও চলে না। একখানা দা, একটা

লাঙল, দুইটি মেটে কলসী, বা একজোড়া গামছার জন্য আমার একটা আস্ত গাভীকে চারি ভাগ করিয়া চারি জনকে দিতে পারি না। তারপর চর্মকারের যখন চাল কেনা দরকার, তখন পাদুকার দরকার এমন গৃহস্থকে হয়তো খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কিংবা কোনো কারিকর তার নিজের পণ্য বিক্রয় করিতে চাহিতেছে, কিন্তু সেই মুহূর্তে তার আর অন্য কোনো পণ্য ক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই।

মানুষের তখন চেষ্টা হইল এমন একটা জিনিসকে মধ্যস্থ খাড়া করা—যাহার প্রয়োজনীয়তা সকলের নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক, যাহার মাপকাঠিতে অন্য সব জিনিসের মূল্য নিরূপিত হইতে পারে এবং যাহার মধ্যস্থতায় তাহা হস্তান্তর বা বেচাকেনা চলিতে পারে। তাই অর্ধ সভ্যতার যুগে, ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন রকমের জিনিস, যেমন গোধন, ধান, চাল, লবণ, পশম, চা, কোকো, তামাক, কড়ি প্রভৃতি এই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিয়াছে। এই অবস্থাটাকে আমরা বার্টার ও আর্থিক যুগের ঠিক মধ্য-অবস্থা বলিতে পারি। আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিমাণ তখন পর্যন্ত সামান্য ছিল এবং ভিন্ন জনপদের সহিত বেচাকেনার সম্পর্ক তেমন প্রসারলাভ করে নাই; তাই আমরা ধান-চালের পরিবর্তে দেশী জোলার গামছা, কামারের দা ও লাঙলের ফাল কিনিতে পারিতাম। কিন্তু বর্তমান কালে ধান-চাল দিয়া আমরা বিলাতী হাওয়া-গাড়ি, এমন কি, কাশ্মীরী শাল কিনতে পারি কি? কাজেই যখন বিভিন্ন দেশে অসংখ্য রকমের পণ্য তৈরি হইতে শুরু হইল এবং বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে স্থানকালের দূরত্ব ঘুচিয়া গিয়া অবারিত পণ্য-বিনিময় চলিতে লাগিল, তখন বার্টার পন্থায় তো কাজ চলিলই না, ধান-চাল, গোরু, ভেড়া, লবণ, পশমের দালালি বা মধ্যস্থতাও অচল হইল। তাই ইহার পরের যুগে অর্থরূপ দালালের আমরা রূপান্তর দেখিতে পাই। এ সময়ে তিনি ধান-চাল, গো-ধনের রূপ পরিহার করিয়া ধাতুরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন; অর্থাৎ তিনি তখন স্বর্ণ ও রৌপ্য আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ইহাকে অর্থের কৈশোর কিংবা প্রথম যৌবনের অবস্থা বলিতে পারি; তখন পর্যন্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রা ব্যবহার করিতে মানুষ শিখে নাই, কেবল ঐ সব ধাতু-খণ্ডের সাহায্যে বেচাকেনা করিতে শুরু করিয়াছে। তাহাতে একটা অসুবিধা

এই হইত যে, গবর্নমেণ্টের দেওয়া কোনো একটা নির্দিষ্ট ওজন বা মূল্য নির্ধারিত না থাকায় প্রত্যেকবার স্বর্ণ ও রৌপ্যখণ্ডকে ওজন ও পরখ করিয়া নিবার প্রয়োজন হইত।

মানুষ যখন সভ্যতার আরও এক ধাপ উঁচুতে উঠিল, তখনই সে নির্দিষ্ট ওজন ও আকৃতির স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রার প্রচলন করিতে সমর্থ হইল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিস্তারের সাথে সাথে অর্থের এই সার্বভৌম রূপের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল। যে অর্থ পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বমানবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে, "তোমাদের যত পণ্যসম্ভার বা ঐশ্বর্য আছে তার বিনিময়ে আমাকে গ্রহণ করো, আমি আলাদীনের প্রদীপের মতো তোমাদের সকল অভাব পূরণ করিব"—তাহার এমন একটা রূপ হওয়া চাই যাহাকে সহজে চেনা যায়, যাহার জগদ্ব্যাপী একটি নিজস্ব মূল্য বা মর্যাদা আছে, যাহাকে রক্ষা করিতে বা হস্তান্তর করিতে অসুবিধা হয় না, অধিকন্তু যাহা টেকসই এবং মূল্যের তুলনায় আকারে বৃহৎ নহে। এই সব গুণ আছে বলিয়াই স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রা সর্বদেশে একাধিপত্য অর্জন ও কৌলীন্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

অর্থ যাবতীয় কেনাবেচা ও কাজকর্মের মূল্য আদান-প্রদানে মধ্যস্থ দালালরূপে কাজ করে; তারই ফলে পণ্যোৎপাদক কোথায় খরিদ্দার পাওয়া যাইবে সে ভাবনা না ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে পণ্য উৎপাদন করিয়া যায় এবং খরিদ্দারও তাহার ইচ্ছামতো যখন-খুশি জিনিস পছন্দ করিয়া কিনিতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমরা যেমন গজ দিয়া কাপড় ও ওজন দিয়া দুধ-ছানা মাপিয়া থাকি, তেমনি সকল রকম জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করিবার জন্য আমরা এই অর্থরূপ মাপকাঠি ব্যবহার করি। তাহা না হইলে অসংখ্য রকম জিনিসের কেনাবেচায় তাহাদের পারস্পরিক মূল্য নির্ধারণ করিতে আমাদের গলদ্ঘর্ম হইতে হইত। তৃতীয়ত, অর্থ আছে বলিয়াই ধারে কাজকর্ম করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে ধার বাদ দিয়া কাজ চলিতে পারে না। যে পরিমাণ মূল্য আমি ধার করিয়াছি ঠিক সেই পরিমাণ মূল্য আমাকে ন্যায়ত প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। সুদের কথা স্বতন্ত্র। একটা নির্দিষ্ট মূল্যের (অর্থরূপ) মাপকাঠি সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই আজিকার

ঋণ তিন মাস বা তিন বৎসর পরে শোধ দেওয়া সম্ভবপর হইতেছে। অর্থের আর একটি বড়ো কাজ হইতেছে, ধনসঞ্চয়ে সহায়তা করা। ধান, চাল, গম বা অন্য যে কোনো পদার্থের তুলনায় স্বর্ণ ও রৌপ্যকে একপ্রকার অজর-অমর বলা যাইতে পারে। অর্থ আছে বলিয়াই ঐশ্বর্য ও সম্পদকে আমরা স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারি এবং তাহারই সহায়তায় আবার নূতন ঐশ্বর্য ও সম্পদ সৃষ্টি করিতে পারি। নহিলে আমাদের ঘরে আমরা কতটুকু সম্পদ ধরিয়া রাখিতে পারিতাম?

অর্থের এই চারিটি প্রধান কর্ম ধাতু-মুদ্রা দ্বারা যতটা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় আর কিছু দ্বারা তেমন হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া ধাতুরূপে পৌঁছিয়াই অর্থের ক্রমপরিণতির পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। ইহার পরের ধাপে অর্থ পূর্ণ বিকাশ লাভ করিলেন এবং কাগজের হালকা রূপ গ্রহণ করিয়া নিজের চলাফেরাটাকে আরো সহজ করিয়া নিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে মানুষ শ' ও হাজারের কোঠা পার হইয়া লাখের কোঠায় আসিয়া পৌঁছাইল, তখন দেখা গেল এতগুলি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া চলাফেরা করা, কাজকর্ম চালানো অসুবিধা ও বিপজ্জনক। তখনই সৃষ্টি হইল কাগজী নোটের।



দেশবন্ধু প্রসঙ্গ

সুভাষচন্দ্র বসু

দেশবন্ধুর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের সকল কথা আমি অবগত নই। জীবন-চরিতের মধ্যে যে সব কথা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও বোধহয় আমি জানি না। তাঁহার জীবনের মাত্র তিন বৎসর কাল আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম এবং অনুচর হইয়া তাঁহার কাজ করিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যেও চেষ্টা করিলে তাঁহার নিকট অনেক কিছু শিখিতে পারিতাম, কিন্তু চোখ থাকিতে কি আমরা চোখের মূল্য বুঝি? বিশেষত দেশবন্ধু সম্বন্ধে আমার ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অন্তত আরো কয়েক বৎসর জীবিত থাকিবেন এবং তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন না হওয়া পর্যন্ত তিনি মর্ত্যলোকের কর্মভূমি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন না। দেশবন্ধু নিজের কোষ্ঠীকে খুব বিশ্বাস করিতেন। আমি অবিশ্বাসী হইলেও তাঁহার বিশ্বাস যে আমার মনের উপর সংক্রামক প্রভাব বিস্তার করে নাই, এ-কথা বলিতে পারি না। আমার যতদূর স্মরণ আছে তিনি বহুবার আমায় বলিয়াছিলেন যে, সমুদ্রপারে দুই বৎসর কারাবাস তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে। কারাবাসের অবসানে তিনি সসম্মানে প্রত্যাবর্তন করিবেন; কর্তৃপক্ষের সহিত মিটমাট হইবে এবং তিনি রাজসম্মানে ভূষিত হইবেন; তারপর তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিবে। সে সময়ে আমি বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার সহিত সমুদ্রপারে যাইতে আমিও প্রস্তুত। সত্য কথা বলিতে কি, সমুদ্রপারে আসার পর তাঁহার কোষ্ঠীর কথা স্মরণ করিয়া আমার মনে সর্বদা আশঙ্কা হইত—পাছে তাঁহাকেও আসিতে হয়, কিন্তু সে দুর্ভাগ্য অপেক্ষা শতগুণে দারুণ দুর্ভাগ্য বাঙলার, তথা ভারতের ভাগ্যে ঘটিল।

দেশবন্ধুর সহিত আমার শেষ দেখা আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। আরোগ্য-লাভের জন্য এবং বিশ্রাম পাইবার ভরসায় তিনি সিমলা পাহাড়ে গিয়াছিলেন, আমাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সিমলা হইতে রওনা হইয়া কলিকাতায় আসেন। আমাকে দেখিতে তিনি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে দুইবার আসেন এবং আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয় আমার বহরমপুর জেলে বদলি হইবার পূর্বে। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হইলে আমি তাঁহার পায়ের ধুলো লইয়া বলিলাম, "আপনার সঙ্গে আমার বোধ হয় অনেক দিন দেখা হইবে না।" তিনি তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ও উৎসাহের সহিত বলিলেন, "না, আমি তোমাদের শিগ্‌গির খালাস করে আনছি।" হায়, তখন কে জানিত যে ইহজীবনে আর তাঁহার দর্শন পাইব না?......

জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধুর অতুলনীয় অলৌকিক প্রভাবের গূঢ় কারণ কী অনেকে এ প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি সর্বপ্রথমে অনুচর হিসাবে তাঁহার প্রভাবের একটি কারণ নির্দেশ করিতে চাই। আমি দেখিয়াছি তিনি সর্বদা মানুষের দোষগুণ বিচার না করিয়া তাহাকে ভালোবাসিতে পারিতেন। যাহাদিগকে আমরা সাধারণত ঘৃণায় ঠেলিয়া ফেলি, তিনি তাহাদিগকে বুকে টানিয়া লইতে পারিতেন। তাঁহার সহকর্মীরা ছিলেন তাঁহার পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁহাদের উপকার অথবা মঙ্গলের জন্য কী না করিতে প্রস্তুত ছিলেন? জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না—এ-কথা একশো বার সত্য। দেশবন্ধুর জীবন ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।......

সাধারণ সাংসারিক জীবের ন্যায় দেশবন্ধুর আত্ম-পর জ্ঞান ছিল না। তাঁহার বাড়ি সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার অন্তরের এবং বাহিরের সম্পদের উপর সকলের দাবি ছিল। তিনি তাঁহার অনুচরবৃন্দকে যে শুধু ভালোবাসিতেন তাহা নয়, তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা সহিতেও প্রস্তুত ছিলেন। একদিন তাঁহার একজন নিকট আত্মীয় তাঁহার কোনও সহকর্মীর দোষ ও ত্রুটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "I hate him"—আমি তাকে ঘৃণা করি। তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলেন, "আমার মুশকিল এই যে আমি তাকে ঘৃণা করতে পারি না।"......

তিনি যে পর্বতের ন্যায় অটল সঙ্ঘ গঠন করিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল

নায়ক ও অনুচরবর্গের মধ্যে প্রাণের সংযোগ। ইহা ব্যতীত দোষগুণ-নির্বিশেষে, ভালোবাসিবার ক্ষমতার সাহায্যে এবং তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশলের দ্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন পন্থী ও ভিন্ন রুচির লোকদিগকে একত্র চালাইতে পারিতেন। তাঁহার দলের অন্তর্ভুক্ত নহেন অথবা তাঁহার মত পোষণ করেন না এরূপ বহুলোক গোপনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।......

দেশবন্ধু যে সহজ ও অনাবিল রসিকতার অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন এ-কথা আমি জেলখানায় ভালো রকম বুঝিতে পারি। কত রকমের রসিকতার দ্বারা তিনি দিনের পর দিন সকলকে আমোদিত করিয়া রাখিতেন! প্রেসিডেন্সি জেলে আমাদের পাহারার জন্য সঙ্গিনধারী গুর্খা সৈনিক নিযুক্ত হইয়াছিল। একদিন সকালে উঠিয়া তিনি দেখিলেন গুর্খা সৈনিকের পরিবর্তে একজন রুলধারী হিন্দুস্থানী সিপাহি উপস্থিত। অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি হে সুভাষচন্দ্র, শেষটা অসি ছেড়ে বাঁশি; আমরা কি এতই নিরীহ।"......

ভারতে হিন্দু জননায়কদের মধ্যে দেশবন্ধুর মতো ইসলামের এত বড়ো বন্ধু আর কেহ ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। তিনি হিন্দুধর্মকে এত ভালোবাসিতেন যে, তার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন অথচ তাঁর মনের মধ্যে গোঁড়ামি আদৌ ছিল না। তিনি শিক্ষার (culture) দিক দিয়া হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে মৈত্রী সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেন। হিন্দু শিক্ষা ও ইসলামীয় শিক্ষার (culture) মধ্যে কোথায় মিল পাওয়া যায় এ বিষয়ে কারাগারে মৌলানা আক্রাম খাঁর সহিত তাঁহার প্রায়ই আলোচনা হইত।......

জেলখানার আর একটি ঘটনার উল্লেখ আমি এস্থলে না করিয়া পারি না—কয়েদীর প্রতি তাঁহার ভালোবাসা। আমরা যে সময়ে প্রেসিডেন্সি জেল হইতে আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত হই, সে সময়ে আলিপুর জেলে আমাদের ওয়ার্ডে (ward) মথুর নামে একজন কয়েদী কাজ করিত। জেলের ভাষায় যাহাকে বলে "পুরানা চোর" মথুর তাহাই ছিল। আট দশ বার সে জেলখানায় ঘুরিয়াছে। কিছুদিন কাজকর্ম করিবার পর দেশবন্ধুর উপর মথুরের ভক্তি ও ভালোবাসা জন্মিল—সে তাঁহাকে বাবা বলিয়া ডাকিতে লাগিল। মথুরের প্রতিও দেশবন্ধুর সমবেদনা ও ভালবাসা জাগরিত হইল। মথুর তাহার জীবনের সকল ইতিহাস তাঁহাকে বলিত। মুক্তির সময় নিকটবর্তী হইলে

দেশবন্ধু তাহাকে বলিলেন যে তাহার খালাসের পর তিনি তাহাকে নিজের বাড়িতে রাখিবেন, যেন সে অসৎ সঙ্গে পড়িয়া পুনরায় ডাকাতিতে মন না দেয়। মথুরের খালাসের দিন দেশবন্ধু লোক পাঠাইয়া তাহাকে জেলখানা হইতে নিজের বাড়িতে লইয়া আসেন।

('তরুণের স্বপ্ন' হইতে সংকলিত)



দেবী মনসার ক্রোধ

দীনেশ চন্দ্র সেন

[চাঁদের পুত্র লক্ষ্মীন্দরের বিবাহরাত্রে সর্পাঘাতে মৃত্যু হইবে। লৌহ-বাসরঘর নির্মাণ করিয়া চাঁদ পুত্রকে রক্ষা করিবার আয়োজন করিলেন—কিন্তু পুত্রকে রক্ষা করিতে পারিলেন না।]

চাঁদ সাঁতালী-পর্বতে লৌহের বাসর নির্মাণ করিতে কামিলা নিযুক্ত করিয়া দিলেন, এবং সেই লৌহগৃহের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত রহিলেন। প্রকান্ড লৌহের প্রাচীর, লৌহের কপাট, লৌহের ছাদ উত্থিত হইল। সাঁতালী-পর্বতের প্রস্তর খুঁড়িয়া লৌহময় ভিত্তি নির্মিত হইল,—তদুপরি লৌহের তোরণ মেঘ স্পর্শ করিয়া রহিল, এবং বিশাল লৌহগৃহ যমপুরীর কারাগৃহের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। সেই গৃহের বহির্দেশে শত শত সান্ত্রী প্রহরী নিযুক্ত রহিল। বহুসংখ্যক নেউল শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া সেই বিশাল লৌহ-প্রাচীরের চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল; তাহাদের সুতীক্ষ্ন দন্ত ও নখাগ্র সর্পদেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য উন্নত হইয়া রহিল। নেউলদিগের শ্রেণী হইতে ঈষৎ দূরে ইন্দ্রায়ুধতুল্য পুচ্ছ উন্মুক্ত করিয়া শিখিগণ ভ্রমণ করিতে লাগিল, তাহাদের পদাঙ্গুলী ও চঞ্চু সর্প ধরিবার জন্য প্রস্তুত থাকিয়া সাঁতালী-পর্বতের গাত্রে তৃণশষ্প ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। সেই গৃহের চতুর্দিকে বিচিত্র বৃক্ষমূল ও লতাগুল্ম বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহাদের তীব্র-গন্ধে সর্প-সমাজ সাঁতালী-পর্বত ত্যাগ করিয়া দূরদূরান্তরে প্রস্থান করিল।

মনসাদেবী আকাশ হইতে এই দৃঢ়রক্ষিত পর্বতদুর্গ দেখিয়া চিন্তান্বিত হইলেন!

তিনি লৌহের বাসরঘর নির্মাতাকে দেখা দিয়া বলিলেন, "একটি কেশ

প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ সূক্ষ্ম ছিদ্র লৌহের গৃহ-দেয়ালে রাখিতে হইবে।" কামিলা, দেবীকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "আমাকে সদাগর বেতন ও পুরস্কারাদি প্রদানপূর্বক বিদায় করিয়া দিয়াছেন, এখন যন্ত্র লইয়া কোন্ ছলে সেই গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিব!" দেবী তাহাকে ভয় দেখাইলেন,—এমন কে দৃঢ়চেতা পুরুষ আছে যে, বিষহরী দেবীর ক্রোধকে ভয় না করে? কামিলা সম্মত হইয়া পুনরায় ভালো করিয়া গৃহ দেখিবার ছলে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র প্রস্তুত করিল এবং তাহা কয়লার গুঁড়া দিয়া পূর্ণ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

চাঁদ-সদাগর পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া সাঁতালী-পর্বতে লৌহগৃহে রাখিলেন। স্বয়ং উন্মত্তের ন্যায় যষ্টি হস্তে সেই গৃহের সান্ত্রীদিগের তত্ত্বাবধান করিয়া বিনিদ্রভাবে রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন।

এদিকে আকাশে এক নিবিড় মেঘগৃহে মনসাদেবী উপবিষ্ট হইয়া সর্পগণকে স্মরণ করিলেন। সেই গৃহের শীর্ষে একটা প্রকাণ্ড উল্কা-শিখা পতাকার ন্যায় ঊর্ধ্বে দুলিতেছিল; সর্পের অমূল্য মণিগুলি গৃহের সর্বত্র ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। মনসার আহ্বানে দিগ্‌দিগন্তর হইতে সর্পসমূহ তথায় ছুটিয়া আসিল,—তাহারা কেহ একশীর্ষ, কেহ বহুশীর্ষ, কাহারও দেহ চক্রাঙ্কিত বিচিত্র বর্ণে সুশোভিত, কাহারও শরীর শুধু স্বর্ণরেখাময়। বিড়ঙ্গিণী, তক্ষক, বঙ্গদাড়া, শঙ্কর, তালভঙ্গ প্রভৃতি অসংখ্য সর্প তথায় উপস্থিত হইল, তাহাদের গতিতে মরুৎ মন্থর প্রতিপন্ন হইল, সংহারিকা শক্তি ও চাঞ্চল্যে বিদ্যুৎ পরাস্ত হইল।

লক্ষ্মীন্দরকে দংশন করিতে কে যাইবে, দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্পকুল মাথা হেঁট করিল। একটা কোপনস্বভাব রক্তচক্ষু সর্প বলিল, "সাঁতালী-পর্বতে যে সকল তরুমূল সঞ্চিত হইয়াছে তাহার গন্ধ দূর হইতে পাইয়া আমার হাঁপানি রোগ জন্মিয়াছে।" বিষদন্ত বিকাশ করিয়া ত্রিশীর্ষ মহিজঙ্গ বলিল, "ময়ূর ও নকুলের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে কে? তাহাদের ভয়ে আমার মাতুল ভ্রাতারা বহুপুরুষের বাসস্থান সাঁতালী ছাড়িয়া নীলগিরিতে আশ্রয় লইয়াছে।" দংশক সর্প রোষাবিষ্ট চক্ষু আবর্তন করিয়া বলিল, "চাঁদ-সদাগর জগতের যত রোঝা সাঁতালী-পর্বতে জড়ো করিয়াছে, তাহারা যেখানে গর্ত পায়,

সেইখানেই মন্ত্র পড়ে ও তরুমূল নিক্ষেপ করে, অহিকুল গর্তের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লৌহগৃহের একটা ছিদ্র আছে, কিন্তু যে সকল সান্ত্রী পাহারা দিতেছে তাহারা এক এক জন চণ্ডু ও আফিম এক এক ভরি এক এক বারে খাইয়া চক্ষু এমন রক্তবর্ণ করিয়া রাখিয়াছে যে তাহাদিগকে দেখিলে আমাদেরই ভয় হয়, তাহাদের দাঁতে যে বিষ জন্মিয়াছে তাহাতে আমাদেরই মৃত্যু হইতে পারে, অন্তত আমাদের বিষে তাহাদের কিছু হইবার নয়। তাহারা মাথা নীচু করিয়া না কামড়াইলেও তাহাদের সঙ্গিনের খোঁচা খাইলে আমরা বাঁচিব না।"

মনসাদেবী পুনর্বার বলিলেন, "আমি এ সকল ভীরুর বাক্য-কৌশল শুনিতে চাহি না, অহিকুলে কি এমন কেহ নাই, যে সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া লক্ষ্মীন্দরের বাসরগৃহে প্রবেশপূর্বক তাহাকে দংশন করে? যে সকল বিপদ পথে আছে, তাহা সকলেই অবগত, অশক্তগণের মুখে তাহা আমি শুনিতে চাহি না। যে বিপদে নির্ভীক, সে-ই অগ্রসর হউক।"

তখন ভীষণ ফণা বিস্তার করিয়া বঙ্করাজসর্প অগ্রসর হইল এবং নীরবে দেবীর প্রসাদ-চিহ্ন পানে মাথা ঠেকাইয়া সাঁতালী-পর্বতের দিকে যাত্রা করিল।

তখন বেহুলা-সতী অন্ন রন্ধন করিতেছিলেন; সেই কালরাত্রিতে চারিদিক হইতে কী একটা শব্দ শুনা যাইতেছিল, চাঁদবেনে গৃহের চারিদিক ঘুরিয়া মাঝে মাঝে যে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন একি তাহারই প্রতিধ্বনি? সহসা বেহুলা দেখিলেন, লৌহের দেয়ালে একটা স্থানের লৌহপিণ্ড টুটিয়া যাইতেছে, তাহা হইতে লৌহচূর্ণ খসিয়া পড়িতেছে; বলা বাহুল্য, সেগুলি কয়লার গুঁড়া। সেই ছিদ্র-পথে ফণা বিস্তার করিয়া বঙ্করাজ প্রবেশ করিল। বেহুলা সোনার বাটিতে কাঁচা দুগ্ধ ও রামরম্ভা রাখিয়া সেই সর্পের সম্মুখে ধারণ করিলেন, আহারের লোভে বঙ্করাজ মাথা হেঁট করিয়া বাটিতে মুখ প্রবেশ করাইল—বেহুলা সোনার সাঁড়াশি দ্বারা তদবস্থায় সর্পকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। দ্বিপ্রহর রাত্রে কালদন্ত সর্প এবং তৃতীয় প্রহর রাত্রে উদয়কাল সর্প সেই ভাবেই বন্দী হইল—শেষরাত্রে বেহুলা লক্ষ্মীন্দরকে ভাত খাইতে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু লক্ষ্মীন্দর গভীর নিদ্রাভিভূত, কোনো সাড়া দিলেন না।

সমস্ত রাত্রির দুশ্চিন্তা ও শ্রমে উপবাসী বেহুলা ক্লান্ত হইয়াছিলেন। বন্দী সর্পত্রয়কে একটা বৃহৎ পাত্রদ্বারা চাপা রাখিয়া, বেহুলা স্বামীর পদপ্রান্তে আসিয়া বসিলেন, তাঁহার চক্ষু দুটি ঘুমে ভাঙিয়া আসিতে লাগিল, এক একবার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তিনি সেই রন্ধ্রপথের দিকে লক্ষ্য রাখিতেছেন এবং ঘুমে হেলিয়া পড়িতেছেন;—এমন সময় বায়ুগতি কাল-নাগিনী মনসাদেবীর তাড়া খাইয়া রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল,—গৃহপ্রবেশকালে হঠাৎ "কেও"—স্বরে কালনাগিনীর অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল—ক্ষণকাল সে নড়িল না। কে জানে কেন বিনিদ্র চাঁদ সেই সময়ে কোন্ গূঢ় অনিষ্টের আশঙ্কায় "কেও" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন।

কিছুকাল নিশ্চল থাকিয়া কালনাগিনী আবার চলিল, তখন বেহুলা ক্ষণকালের জন্য নিদ্রিত হইয়া স্বামীর পদ-পার্শ্বে শুইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহার নিদ্রিতললাটে একটা দুশ্চিন্তার রেখা জাগিয়া আছে।

দ্রুত-গতিতে কালনাগিনী লক্ষ্মীন্দরের পদের সন্নিহিত হইল, এই সময়ে নিদ্রাবেশে পাশ ফিরিতে যাইয়া, লখার পদ সর্পের দেহে আঘাত করিল, অমনই কালনাগিনী উদ্যত-ফণা হইয়া তাহাকে দংশন করিল, লক্ষ্মীন্দর চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"জাগো ওহে বেহুলা সায়বেনের ঝি।

তোরে পাইল কালনিদ্রা মোরে খাইল কি॥"

বেহুলা শশব্যস্তে জাগিয়া দেখিতে পাইলেন, কালনাগিনী দ্রুতগতিতে রন্ধ্রপথে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে—অমনি কাটারি দ্বারা তাহার অষ্টাঙ্গুলিপ্রমাণ পুচ্ছ কাটিয়া ফেলিলেন;—পুচ্ছহীনা কালনাগিনী তড়িৎ-গতিতে পলাইয়া গেল।

তখন পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হইয়াছে; সনকা পুত্র ও পুত্রবধূর মুখ দেখিবার জন্য সাঁতালী-পর্বতে হৈমবতীর ন্যায় আশিস্‌হস্তে দণ্ডায়মানা, ত্রিশূলধারী মহাদেবের ন্যায় সেই দ্বারদেশে হিন্তালের যষ্টিহস্তে ভানু-কিরণোজ্জ্বল উন্নতকায় চন্দ্রধর চিত্রপটের ন্যায় স্থির। রাত্রি পোহাইয়া গিয়াছে;—চন্দ্রধর ভাবিতেছেন বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাঁহার বক্ষ কেন ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে, নেত্রদ্বয় কেন ব্যস্ত হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে?

জাতীয় আন্দোলনের এক অধ্যায়

জওহরলাল নেহরু



[স্বনামখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক অনূদিত শ্রীজওহরলাল নেহরুর 'আত্মচরিত' হইতে কিয়দংশ এখানে সংকলিত হইয়াছে। ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী লবণ-আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। গৃহীতাংশে লেখক সেই আন্দোলনের সূচনাপর্বের ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়াছেন।]

১৯৩০-এর ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস আসিল। বিদ্যুৎচমকের মতো আমরা দেশের আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখিতে পাইলাম। সর্বত্র বৃহৎ জনতা নিস্তব্ধ গাম্ভীর্যপূর্ণ, স্বাধীনতার সংকল্পবাক্য উচ্চারণ করিতেছে, সে এক মহান্ দৃশ্য। সেখানে কোনো বক্তৃতা নাই, অনুরোধ-উপরোধ নাই। এই অনুষ্ঠান হইতে গান্ধিজি প্রেরণা লাভ করিলেন এবং দেশের নাড়ীর গতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বুঝিলেন, কার্য করার সময় উপস্থিত। রঙ্গমঞ্চে ঘটনার দ্রুত সমাবেশে মহানাট্য জমিয়া উঠিল।

সহসা লবণ শব্দটি অপূর্ব রহস্য ও শক্তিতে মণ্ডিত হইল। লবণকরকে আক্রমণ করিতে হইবে, লবণ-আইন ভঙ্গ করিতে হইবে। আমরা হতভম্ব হইলাম। জাতীয় সংঘর্ষের সহিত অতি সাধারণ লবণের সম্পর্ক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।...পূর্ণ স্বাধীনতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, গান্ধিজিও কি তাহাই বুঝেন, অথবা আমাদের বলিবার ভাষা স্বতন্ত্র? ঘটনার রথচক্র চলিতে লাগিল, তর্ক করার অবসর রহিল না।

তারপর গান্ধিজির সহিত বড়োলাটের পত্রবিনিময় হইল এবং সবরমতী আশ্রম হইতে ডাণ্ডি অভিযান আরম্ভ হইল। দিনের পর দিন এই তীর্থ-

যাত্রীদের অগ্রসর—জনসাধারণ উৎসুক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল এবং দেশব্যাপী উৎসাহানল প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। আসন্ন আন্দোলন পরিচালনার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য আহম্মদাবাদে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন বসিল। আন্দোলনের নেতা অনুপস্থিত, তিনি তীর্থযাত্রীদের লইয়া সমুদ্রতীরে চলিয়াছেন এবং ফিরিয়া আসিতে অস্বীকৃত হইলেন। সকলে গ্রেফ্তার হইবার সম্ভাবনায় সভায় স্থির হইল, কমিটির সমস্ত ক্ষমতা সভাপতির থাকিবে, তিনি কার্যকরী সমিতির শূন্যপদে অপরকে মনোনীত করিবেন এবং তিনি স্বয়ং গ্রেফ্তার হইলে পরবর্তী সভাপতি মনোনীত করিয়া যাইবেন, তাঁহারও অনুরূপ ক্ষমতা থাকিবে। প্রাদেশিক ও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলিকেও অনুরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইল।

এইভাবে ব্যবস্থা করিয়া আমরা আহম্মদাবাদে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির সহকর্মীদের নিকট বিদায় লইলাম। কে জানে, কবে কোথায় কাহার সহিত কী ভাবে দেখা হইবে, হয়তো বা আমরা আর একত্র মিলিবই না। আমরা তাড়াতাড়ি নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিয়া নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্দেশানুযায়ী স্থানীয় ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম এবং সরোজিনী নাইডুর ভাষায় জেলে যাইবার জন্য দাঁতন হাতে করিয়া বসিয়া রহিলাম।

ফিরিবার পথে আমি ও পিতা গান্ধিজির সহিত দেখা করিলাম। জাম্বুসারে তিনি ও তাঁহার দলবলের সহিত আমরা কয়েক ঘণ্টা ছিলাম। তিনি লবণসমুদ্র লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পরবর্তী গন্তব্যস্থলে যাত্রা করিলেন। এবারের মতো তাঁহার সহিত এই শেষ দেখা। যষ্টিহস্তে সকলের পুরোভাগে তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন।—তাঁহার মুখমণ্ডল নির্ভীক প্রশান্ত। কী মহিমময় দৃশ্য!

এপ্রিল আসিল, গান্ধিজি ক্রমশ সমুদ্রের নিকটবর্তী হইতেছেন, আমরা লবণ-আইন ভাঙিয়া আইন অমান্যের জন্য আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছি।...... ৬ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিবস, সত্যাগ্রহ হইতে জালিয়ানওয়ালাবাগ —১৯১৯-এর সেই স্মৃতি স্মরণ করিয়া বাৎসরিক অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। গান্ধিজি ঐ দিবস ডাণ্ডির বেলাভূমিতে লবণ-আইন ভঙ্গ করিলেন। তিন চারি দিন পরে সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্ব স্ব এলাকায়

ঐরূপ করিবার নির্দেশ দিয়া আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে বলা হইল।

মনে হইল যেন বাঁধ ভাঙিয়া অকস্মাৎ বন্যার জল আসিয়াছে। দেশের সর্বত্র, প্রতি পল্লী-নগরীতে লবণ তৈয়ারির কথা আলোচিত হইতে লাগিল, এবং লবণ তৈয়ারির নানারূপ অদ্ভুত উপায় আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। আমরা এ বিষয়ে অল্পই জানিতাম, পুঁথিপত্র খুঁজিয়া কিছু আবিষ্কার করা গেল। লবণ তৈয়ারির নিয়ম ছাপাইয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইল। আমরা হাঁড়ি-কড়াই সংগ্রহ করিয়া অনেক কষ্টে লবণের মতো একরকম পদার্থ তৈয়ারি করিলাম। তাহাতেই কত আনন্দ! এবং উহাই উচ্চ মূল্যে ফেরি করিয়া বিক্রয় হইতে লাগিল। লবণ ভালো হউক মন্দ হউক, কিছু যায় আসে না, নিন্দনীয় লবণ-আইন ভঙ্গ করাই প্রধান কথা। আমাদের লবণ খারাপ হইলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। লবণ তৈয়ারি দাবানলের মতো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। জনসাধারণের উৎসাহের অন্ত রহিল না। গান্ধিজি যখন প্রথম এই প্রস্তাব করেন, তখন তাহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম বলিয়া লজ্জা ও কুণ্ঠা অনুভব করিলাম। এই মনুষ্যটির জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া শৃঙ্খলিতভাবে কার্যে নিয়োগ করিবার কী আশ্চর্য শক্তি, আমরা বিস্মিত হইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ১৪ই এপ্রিল আমি গ্রেফ্‌তার হইলাম। মধ্যপ্রদেশের রামপুরে একটি সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য ঐ দিবস আমি যাত্রা করিয়াছিলাম। ঐ দিনই কারাগারের মধ্যে আমার বিচার হইল, লবণ-আইন ভঙ্গ করার জন্য আমি ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলাম।

প্রতিদিন কী উৎসাহ, কী উত্তেজনা, কত রোমাঞ্চকর সংবাদ—মিছিল ও যষ্টিপ্রহার, গুলিবর্ষণ, বিখ্যাত নেতাদের গ্রেফ্‌তারে হরতাল, তাহার উপর পেশোয়ার দিবস, গাড়োয়ালী দিবস প্রভৃতি অনুষ্ঠান! সাময়িকভাবে বিদেশী বস্ত্র ও সর্ববিধ ব্রিটিশ পণ্য বর্জন সম্পূর্ণরূপে সাফল্য লাভ করিল।

সকলের চেয়ে বড়ো সংবাদ ২৩শে এপ্রিলের পেশোয়ারের এবং পরে সমস্ত সীমান্ত প্রদেশের ঘটনাবলী। ভারতের অন্য যে কোনও স্থানে মেশিনগানের গুলিবর্ষণের সম্মুখে সুশৃঙ্খল এবং শান্তিপূর্ণ সাহসিকতার দৃষ্টান্তে সমগ্র

দেশে এইরূপ উত্তেজনার সঞ্চার হইত। সীমান্ত প্রদেশে এই ঘটনার আরও একটা বিশেষ দিক আছে। পাঠানদের সাহসী বলিয়া খ্যাতি আছে বটে; কিন্তু তাহারা শান্ত ও নিরীহ বলিয়া খ্যাতি নাই। এই পাঠানেরাই ভারতবর্ষের সম্মুখে এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল। এবং এই সীমান্ত প্রদেশেই সেই ইতিহাস-স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে গাড়োয়ালী সৈনিকেরা নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। সৈনিকেরা সাধারণত নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ করিতে ঘৃণা বোধ করে, এবং নিঃসন্দেহে জনতার প্রতি সহানুভূতিবশতই তাহারা উহা অস্বীকার করিয়াছিল।......

এইকালে যে সকল আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে নারীদের দলে দলে জাতীয় সংঘর্ষে যোগদান এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁহারা দলে দলে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বাহিরের কাজে অনভ্যস্ত হইলেও তাঁহারা মহোৎসাহে কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদেশী বস্ত্র ও আবগারি দোকানে পিকেটিং করা তাঁহারা একচেটিয়া করিয়া লইলেন। প্রত্যেক শহরে দলে দলে নারী মিছিল করিতে লাগিলেন এবং সাধারণত পুরুষ অপেক্ষা নারীরা অধিক দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতেন।

৫ই মে গান্ধিজি গ্রেফ্‌তার হইলেন। পশ্চিম উপকূলে অধিকতর উৎসাহের সহিত লবণগোলা আক্রমণ ও লবণ সংগ্রহের কাজ চলিতে লাগিল। লবণ-আইন অমান্যকারীদের উপর এইকালে পুলিস-বর্বরতার কতকগুলি বেদনাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল। বোম্বাই আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি হইয়া উঠিল এবং বড়ো বড়ো হরতাল, মিছিল এবং লাঠিচালনা চলিতে লাগিল। লাঠির আঘাতে আহতদের চিকিৎসার জন্য কয়েকটি হাসপাতাল স্থাপিত হইল। বোম্বাই বৃহৎ শহর বলিয়া এখানের ঘটনাগুলি বহুল প্রচারলাভ করিয়াছিল। ছোটোখাটো শহর এবং পল্লী-অঞ্চলের ঘটনাগুলি মোটেই প্রচারিত হয় নাই।

অপুর স্বপ্ন

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' হইতে সংকলিত। অপুর কল্পনাপ্রবণ চিত্তকে এখন শুধু চারিপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়, পুস্তকাদিতে পড়া ঘটনা ও দৃশ্যের অপূর্বতাও আলোড়িত করিয়া তোলে।]

মাছ ধরিতে গিয়া একটা বড়ো সরপুঁটি মাছ কী করিয়া তাহার ছিপে উঠিয়া গেল।

লোভ পাইয়া সে জায়গাটি আর অপু ছাড়ে না—গাছের ডালপালা ভাঙিয়া আনিয়া বিছাইয়া বসে।

ক্রমে বেলা যায়, নদীর ধারের মাঠে আবার সেই অপূর্ব নীরবতা, ওপারের দেয়ালের মাঠের পারে সুদূরপ্রসারী সবুজ উলুবনে, কাশ-ঝোপে, কদম-শিমুল গাছের মাথায় আবার তাহার শৈশব পুলকের শুভমুহূর্তের অতি পরিচিত, পুরাতন সাথী—বিকালের মিলাইয়া-যাওয়া শেষ রোদ।

ছিপ গুটাইয়া সে বাড়ির দিকে যাইবার যোগাড় করে। নদীর ধারে ধারে নতশীর্ষ বাব্‌লা ও সাঁইবাব্‌লার বন নদীর স্নিগ্ধ কালো জলে ফুলের ভার ঝরাইয়া দিতেছে। সোনাডাঙা মাঠের মাঝে ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটার আড়ালে প্রকাণ্ড রক্তবর্ণ সূর্য হেলিয়া পড়িয়াছে,—যেন কোন্‌ দেবশিশু অলকার জ্বলন্ত ফেনিল সোনার সমুদ্র হইতে ফুঁ দিয়া একটা বুদ্‌বুদ তুলিয়া খেলাচ্ছলে আকাশে উড়াইয়া দিয়াছিল, এইমাত্র সেটা পশ্চিম দিগন্তে পৃথিবীর বনান্তরালে নামিয়া পড়িতেছে!

পিছন হইতে কে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। সে জোর করিয়া হাত দিয়া চোখ ছাড়াইয়া লইতেই পটু খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া সামনে আসিয়া বলিল —তোকে খুঁজে খুঁজে কোথাও পাইনে অপুদা; তারপর ভাবলাম তুই ঠিক মাছ ধরতে এইছিস, তাই এলাম। অপুদা, চল্‌ তেঁতুলতলার ঘাটে একখানা ডিঙি দেখি, একটু বেড়িয়ে আসি চল্‌।

দুজনে তেঁতুলতলার ঘাট হইতে একখানা ছোট-ডিঙি খুলিয়া লইয়া তাহাকে এক ঠেলা দিয়া ডিঙির উপর চড়িয়া বসিল। নদীজলের ঠান্ডা আর্দ্র-গন্ধ উঠিতেছে, কলমী-শাকের দামে জলপিপি বসিয়া আছে, চরের ধারে-ধারে চাষীরা পটোলক্ষেত নিড়াইতেছে, কেহ ঘাস কাটিয়া আঁটি বাঁধিতেছে, চালতে-পোতার বাঁকে তীরবর্তী ঘন ঝোপে গাঙশালিকের দল কলরব করিতেছে, পড়ন্ত বেলায় পূব আকাশের গায়ে নানারঙের মেঘস্তূপ।

পটু বলিল—অপুদা একটা গান করো না? সেই গানটা সেদিনের!

অপু বলিল—সেটা নয়! বাবার কাছে সুর শিখে নিয়েছি একটা খুব ভালো গানের। সেইটে গাইব, আর-এটু ওদিকে গিয়ে কিন্তু ভাই, এখানে ডাঙায় ওই সব লোক রয়েছে—এখানে না।

—তুই ভারি লাজুক অপুদা। কোথায় লোক রয়েছে কতদূরে, আর তোর গান গাইতে—দূর, ধর্ সেইটে!

খানিকটা গিয়া অপু গান শুরু করে। পটু বাঁশের চটায় বৈঠাখানা তুলিয়া লইয়া নৌকার গলুইয়ে চুপ করিয়া বসিয়া একমনে শোনে; নৌকা বাহিবার আবশ্যক হয় না, স্রোতে আপনা আপনি ভাসিয়া ডিঙিখানা ঘুরিতে ঘুরিতে লা-ভাঙার বড়ো বাঁকের দিকে চলে। অপুর গান শেষ হইলে পটু একটা গান ধরিল। অপু এবার বাহিতেছিল। নৌকা কম দূরে আসে নাই—লা-ভাঙার বাঁকটা নজরে পড়িতেছিল এরই মধ্যে। হঠাৎ পটু ঈশানকোণের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ও অপুদা, কী রকম মেঘ উঠেছে দেখছিস্? এখুনি ঝড় এল বলে—নৌকো ফেরাবি?

অপু বলিল—হোক্‌গে ঝড়, ঝড়েই তো নৌকো বাইতে—গান গাইতে লাগে ভালো, চল্ আরও যাই।

কথা বলিতে বলিতে ঘন কালো মেঘখানা মাধবপুরের মাঠের দিক হইতে উঠিয়া সারা আকাশ ভরিয়া ফেলিল; তাহার কালো ছায়া নদীজল ছাইয়া ফেলিল। পটু উৎসুক চোখে আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। অনেক দূরে সোঁ সোঁ রব উঠিল, একটা অস্পষ্ট গোলমালের সঙ্গে অনেক পাখির কলরব শোনা গেল, ঠান্ডা হাওয়া বহিল, ভিজা মাটির গন্ধ ভাসিয়া আসিল, পাখাওয়ালা আকন্দের বীজ মাঠের দিক হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতে লাগিল, দেখিতে

দেখিতে গাছপালা মাথা লুটাইয়া, দোলাইয়া, ভাঙিয়া ভীষণ কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল।

নদীর জল ঘন কালো হইয়া উঠিল, তীরের সাঁইবাব্লা ও বড়ো বড়ো ছাতিমগাছের ডালপালা ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, সাদা বকের দল কালো আকাশের নীচে দীর্ঘ সারি বাঁধিয়া উড়িয়া পলাইল। অপুর বুক ফুলিয়া উঠিল, উৎসাহে উত্তেজনায় সে হাল ছাড়িয়া চারিধারে চাহিয়া ঝড়ের কান্ড দেখিতে লাগিল, পটু কোঁচার কাপড় খুলিয়া ঝড়ের মুখে পালের মতো উড়াইয়া দিতেই বাতাস বাধিয়া সেখানা ফুলিয়া উঠিল।

পটু বলিল—বড্ড মুখোড় বাতাস অপুদা, সামনে আর নৌকো যাবে না। কিন্তু যদি উল্টে যায়? ভাগ্যিস্ সুনীলকে সঙ্গে করে আনি নি।

অপু কিন্তু পটুর কথা শুনিতেছিল না, সেদিকে তাহার কান ছিল না—মনও ছিল না। সে নৌকোর গলুইয়ে বসিয়া একদৃষ্টে সম্মুখের ঝটিকাক্ষুব্ধ নদী ও আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার চারিধারে কালো নদীর নর্তনশীল জল, উড়ন্ত বকের দল, ঝোড়ো মেঘের রাশি, দক্ষিণ দেশের মাঝিদের ঝিনুকের স্তূপগুলা, স্রোতে ভাসমান কচুরিপানার দাম সব যেন মুছিয়া যায়! নিজেকে সে 'বঙ্গবাসী' কাগজের সেই বিলাত-যাত্রী কল্পনা করে! কলিকাতা হইতে তাহার জাহাজ ছাড়িয়াছে; বঙ্গোপসাগরের মোহনায় সাগরদ্বীপ পিছনে ফেলিয়া, সমুদ্র-মাঝের কত অজানা ক্ষুদ্র দ্বীপ পার হইয়া, সিংহল-উপকূলের শ্যামসুন্দর নারিকেলবনশ্রী দেখিতে দেখিতে কত অপূর্ব দেশের নীল পাহাড় দূর চক্রবালে রাখিয়া, সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় অভিষিক্ত হইয়া, নতুন দেশের নব নব দৃশ্যপরিবর্তনের মধ্যে দিয়া চলিয়াছে!—চলিয়াছে!—চলিয়াছে!—

এই ইছামতীর জলের মতই কালো, গভীর, ক্ষুব্ধ, দূরের সে অদেখা সমুদ্রবক্ষ, এইরকম সবুজ বনঝোপ আরব সমুদ্রের সে দ্বীপটিতেও। সেখানে এইরকম সন্ধ্যায় গাছতলায় বসিয়া এডেন্ বন্দরে সেই বিলাত-যাত্রী লোকটির মতো সে রূপসী আরবী মেয়ের হাত হইতে এক গ্লাস জল চাহিয়া লইয়া খাইবে। চালতেপোতার বাঁকের দিকে চাহিলে খবরের কাগজের বর্ণিত জাহাজের পিছনের সেই উড়নশীল জলচর পক্ষীর ঝাঁককে সে একেবারে স্পষ্ট দেখিতে পায় যেন!

সে ওই সব জায়গায় যাইবে, ওই সব দেখিবে, বিলাত যাইবে, জাপান

যাইবে, বাণিজ্যযাত্রা করিবে, বড়ো সওদাগর হইবে, অনবরত দেশে-বিদেশে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরিবে, বড়ো বড়ো বিপদের মুখে পড়িবে, চীনসমুদ্রের মধ্যে আজিকার এই মন-মাতানো কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো বিষম ঝড়ে তাহার জাহাজ ডুবুডুবু হইলে "আমার অপূর্ব ভ্রমণ" পঠিত নাবিকদের মতো সেও জালি-বোটে করিয়া ডুবোপাহাড়ের গায়ে-লাগা গুগ্‌লি-শামুক পুড়াইয়া খাইতে খাইতে অকূল দরিয়ায় পাড়ি দিবে!

একথা তাহার ধারণায় আসে না কতদূরে সে সব দেশ, কে তাহাকে লইয়া যাইবে, কী করিয়া তাহার যাওয়া সম্ভব হইবে। আর দিনকতক পরে বাড়ি-বাড়ি ঠাকুরপূজা করিয়া যাহাকে সংসার চালাইতে হইবে, রাত্রিতে যাহার পড়িবার তেলের জন্য মায়ের বকুনি খাইতে হয়, অত বয়স পর্যন্ত যে ইস্কুলের মুখ দেখিল না, ভালো কাপড়, ভালো জিনিস যে কাহাকে বলে জানে না—সেই মূর্খ, অখ্যাত, সহায়সম্পদহীন পল্লীবালককে বৃহত্তর জীবনের আনন্দ-যজ্ঞে যোগ দিতে কে আহবান করিবে?

এসব প্রশ্ন মনে জাগিলে হয়তো তাহার তরুণ-কল্পনার রথবেগ—তাহার আশাভরা জীবন-পথের দুর্বার মোহ, সকল ভয় সকল সংশয়কে জয় করিতে পারিত; কিন্তু এসকল কথা তাহার মনে ওঠে না। শুধু মনে হয়—বড়ো হইলেই সব হইবে, অগ্রসর হইলেই সকল সুযোগ-সুবিধা পথের মাঝে কুড়াইয়া পাইবে...এখন শুধু বড়ো হইবার অপেক্ষা মাত্র! সে বড়ো হইলে সুযোগ পাইবে, দিক দিক হইতে তাহার সাদর আমন্ত্রণ আসিবে, সে জগৎ-জানার, মানুষ-চেনার দিগ্বিজয়ে যাইবে।

রঙিন ভবিষ্যৎজীবন-স্বপ্নে বিভোর হইয়া তাহার বাকি পথটুকু কাটিয়া যায়। বৃষ্টি আর পড়ে না, ঝড়ে কালো মেঘের রাশি উড়াইয়া আকাশ পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। তেঁতুলতলার ঘাটে ডিঙি ভিড়িতেই তাহার চমক ভাঙে; নৌকা বাঁধিয়া পটুর আগে আগে সে বাঁশবনের পথে উল্লাসে শিস্ দিতে দিতে বাড়ির দিকে চলে। সে-ও তাহার মা ও দিদির মতো স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছে।

ভারতের নিকট আরবের ঋণ

প্রফুল্লচন্দ্র রায়



পাশ্চাত্ত্যদেশে বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের প্রচারে আরবীয়গণের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। অতিদূর অতীতে সমগ্র ইউরোপখণ্ডে যখন জ্ঞানের আলোক ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, গ্রীক সভ্যতার শেষ রশ্মিটুকু যখন মুষ্টিমেয় সাধুসন্ন্যাসীর অপরিসর প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, প্রাচ্যের বহু-বিস্তীর্ণ জ্ঞানভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্নসমূহ লইয়া আরবীয়গণ তখন ইউরোপের গৃহদ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। অর্থাৎ জ্ঞানবিজ্ঞানে ইউরোপের বর্তমান অগ্রগতির বীজ আরবীয়গণের সাহায্যে উপ্ত হইল মাত্র।

অল্-নদীম্ নামে পরিচিত আবুল ফরজ মহম্মদ বিন ইশাক্ দশম শতাব্দীতে রচিত তদীয় কিতাব্-অল-ফিরিস্ত্ গ্রন্থে এবং হাজী খলিফা ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ইবন-আবু-উসাইবিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে খলিফা হারুন ও মনসুরের আদেশে হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র, ভৈষজ্যবিজ্ঞান ও ঔষধিতত্ত্ব সম্পর্কিত বহু প্রামাণিক গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

মঙ্খ নামক জনৈক ভারতীয় চিকিৎসক খলিফা হারুন-অল-রশিদের দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করিয়া রাজকীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। খলিফার প্রেরণা এবং উৎসাহে তিনি আরবী ভাষায় সুশ্রুতের অনুবাদ এবং ভারতে ব্যবহৃত বনৌষধিসমূহের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করেন। আরবী ভাষায় চরকের অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল।

হাজী খলিফা অনেক স্থলে প্রশংসামুখর হইয়া বলিয়াছেন যে হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞান, বীজগণিত এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান আরবীয় ছাত্রসমাজ গভীর আগ্রহের সহিত পাঠ করিত। বহু হিন্দু পণ্ডিত খলিফাগণের আমন্ত্রণে

বাগদাদে আসিয়া বসবাস করিতেছিলেন। জ্ঞানলাভের অদম্য স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আরবীয় বৈজ্ঞানিকবৃন্দ হিন্দু পণ্ডিতগণ-পরিচালিত ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে দলে দলে সমবেত হইতেন। বস্তুতপক্ষে ভারতবর্ষে গিয়া বিজ্ঞানচর্চা না করিলে মুসলমান বৈজ্ঞানিকগণের বিজ্ঞানশিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইত না।

খলিফাগণের উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতায়ই যে মুসলমান ছাত্রগণ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসিতেন তাহা নহে, তাহারও বহু বৎসর পূর্বে (৫৩১ হইতে ৫৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেও) বাগদাদ হইতে বিজ্ঞানশিক্ষার উদ্দেশ্যে বহু আরবীয় ছাত্র ভারতে আসিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

আলবেরুনি ১০১৭ হইতে ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে অবস্থিতি করেন। আলবেরুনির প্রভু গজনীপতি সুলতান মামুদ যখন থানেশ্বর, মথুরা, কনৌজ ও সোমনাথের মন্দির নির্বিচারে লুণ্ঠন করিয়া ভারতময় বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া ফিরিতেছিলেন তখন এই জ্ঞানলিপ্সু মুসলমান ছাত্রটি তাঁহার হিন্দু অধ্যাপকবৃন্দের পদতলে বসিয়া সাংখ্য ও পাতঞ্জলের প্রখ্যাত গ্রন্থপাঠে আত্মহারা হইতেছিলেন। আলবেরুনির মৃত্যুর পর তাঁহার প্রসিদ্ধ পারিবারিক গ্রন্থাগার হইতে আলি-বিন-জৈন (Ali-Ibn-Zain) অনূদিত একখণ্ড 'চরক-সংহিতা' পাওয়া যায়। শিক্ষিত আরব অভিজাতের গৃহে চরক-সংহিতার এই সমাদর দেখিয়া বোঝা যায় মুসলমানগণ হিন্দু চিকিৎসা-পদ্ধতিকে কিরূপে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতেন। এই সময় গজনীতে গ্রীক চিকিৎসাপদ্ধতিও প্রসারলাভ করিয়াছিল এবং গ্রীক ও ভারতীয় উভয় পদ্ধতিই পাশাপাশি সমান আদরের সহিত অনুসৃত হইত।

আরবী ভাষায় চরক, সুশ্রুত, নিদান ও অষ্টাঙ্গের অনুবাদসমূহের নাম যথাক্রমে সরক, সুশ্রুদ, বিদান এবং অশাঙ্কর দেওয়া হইয়াছে। ভাষান্তরের সময় নামের বিকৃতি ঘটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। লা-ফঁতেন (La Fontaine) পিল্পে (Pilpay) অথবা বিদ্পাই (Bidpai) নামক হিন্দু গ্রন্থকর্তার কতকগুলি রচনা আপন গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন এবং পিল্পের নিকট তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে পিল্পে অথবা বিদ্পাই ও বিদ্যাপতি এক।

পৃথিবীর রাসায়নিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন হিন্দুগণের অবদান যথাযথভাবে স্বীকৃত হয় নাই। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকবর্গের অনেকেই আরবীয়গণকে রসায়ন-বিজ্ঞানে মূল ব্রতী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয়গণের নিকট আরবীয়গণের ঋণ তাঁহারা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

আরব হইতে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। সুতরাং ভারতের নিকট আরবের ঋণ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিলেই বোঝা যাইবে সভ্য জগতে প্রাচীন ভারতের স্থান কোথায় ছিল। ভারতীয় রসায়ন-শাস্ত্র চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরিপূরক হিসাবেই গড়িয়া উঠে, সুতরাং যাঁহারা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জন্য ভারতীয় গ্রন্থসমূহকে এত সম্মান করিয়াছেন তাঁহারা যে রসায়ন-বিজ্ঞানের প্রথম পাঠও হিন্দু রাসায়নিকগণের নিকট লাভ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কী কারণ থাকিতে পারে?

বেদুয়িনের তাঁবুতে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ একজন বেদুয়িন দলপতির তাঁবুতে আমার নিমন্ত্রণ আছে। প্রথমটা ভাবলুম পারব না, শরীরটার প্রতি করুণা করে না যাওয়াই ভালো। তারপর মনে পড়ল, একদা আস্ফালন করে লিখেছিলুম, "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন"। তখন বয়স ছিল তিরিশের কাছ ঘেঁষে, সে তিরিশ আজ পিছনের দিগন্তে বিলীনপ্রায়। তা হোক, কবিতাটাকে কিছু পরিমাণে পরখ করে না এলে মনে পরিতাপ থাকবে। সকালে বেরিয়ে পড়লুম।

গাড়ি চলল মরুভূমির মধ্যে দিয়ে। বালুমরু নয়, শক্ত মাটি। মাঝে মাঝে নদী থেকে জল এনেছে নালা কেটে, তাই এখানে ওখানে কিছু কিছু ফসলের আভাস দেখা দিয়েছে। পথের মধ্যে দেখা গেল নিমন্ত্রণকর্তা আর-এক মোটরে করে চলেছেন, তাঁকে আমাদের গাড়িতে তুলে নেওয়া হল। শক্ত মানুষ, তীক্ষ্ন চক্ষু, বেদুয়িনী পোশাক।

অর্থাৎ মাথায় একখন্ড সাদা কাপড় ঘিরে আছে কালো বিড়ের মত বস্ত্রবেষ্টনী। ভিতরে সাদা লম্বা আঙিয়া, তার উপরে কালো পাতলা জোব্বা। আমার সঙ্গীরা বললেন, যদিও ইনি পড়াশোনা করেন নি বললেই হয়, কিন্তু তীক্ষ্নবুদ্ধি। ইনি এখানকার পার্লামেন্টের একজন মেম্বর।

রৌদ্রে ধূ ধূ করছে ধূসর মাটি, দূরে কোথাও কোথাও মরীচিকা দেখা দিল। কোথাও মেষপালক নিয়ে চলেছে ভেড়ার পাল, কোথাও চরছে উট, কোথাও-বা ঘোড়া। হু হু করে বাতাস বইছে, মাঝে মাঝে ঘুর খেতে খেতে ছুটছে বালির আবর্ত। অনেক দূর পেরিয়ে এঁদের ক্যাম্পে এসে পৌঁছলুম। একটা বড়ো খোলা তাঁবুর মধ্যে দলের লোক বসে গেছে। কফি সিদ্ধ হচ্ছে, খাচ্ছে ঢেলে ঢেলে।

আমরা গিয়ে বসলুম একটা মস্ত মাটির ঘরে। বেশ ঠান্ডা। মেঝেতে কার্পেট, এক প্রান্তে তক্তপোশের উপর গদি পাতা। ঘরের মাঝখান বেয়ে

কাঠের থাম, তার উপরে ভর দিয়ে লম্বা লম্বা খুঁটির উপরে মাটির ছাদ। আত্মীয়বান্ধবেরা সব এদিকে ওদিকে, একটা বড়ো কাঁচের গুড়গুড়িতে একজন তামাক টানছে। ছোটো আয়তনের পেয়ালা আমাদের হাতে দিয়ে তাতে অল্প একটু করে কফি ঢাললে, ঘন কফি, কালো তেতো। দলপতি জিজ্ঞাসা করলেন, আহারে ইচ্ছা করি কি না, “না” বললে আনবার রীতি নয়। ইচ্ছা করলেম, অভ্যন্তরে তাগিদও ছিল। আহার আসবার পূর্বে শুরু হল একটু সংগীতের ভূমিকা, গোটাকতক কাঠির উপরে কোনোমতে চামড়া-জড়ানো একটা তেড়াবাঁকা একতারা যন্ত্র বাজিয়ে একজন গান ধরলে। তার মধ্যে বেদুয়িনী তেজ কিছুই ছিল না। অত্যন্ত মিহিচড়া গলায় নিতান্ত কান্নার সুরে গান। একটা বড়ো জাতের পতঙ্গের রাগিণী বললেই হয়। অবশেষে সামনে চিলিমচি ও জলপাত্র এল। সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে বসলুম। মেঝের উপর জাজিম পেতে দিলে। পূর্ণচন্দ্রের ডবল আকারের মোটা মোটা রুটি, হাতাওয়ালা অতি প্রকাণ্ড পিতলের থালায় ভাতের পর্বত আর উপরে মস্ত আস্ত একটা সিদ্ধ ভেড়া। দু-তিনজন জোয়ান বহন করে মেঝের উপর রাখলে। পূর্ববর্তী মিহিকরুণ রাগিণীর সঙ্গে এই ভোজের আকৃতি ও প্রকৃতির কোনো মিল পাওয়া যায় না। আহারার্থীরা সব বসল থালা ঘিরে। সেই এক থালা থেকে সবাই হাতে করে মুঠো মুঠো ভাত প্লেটে তুলে নিয়ে আর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। ঘোল দিয়ে গেল পানীয়রূপে। গৃহকর্তা বললেন, আমাদের নিয়ম এই যে, অতিথিরা যতক্ষণ আহার করতে থাকে আমরা অভুক্ত দাঁড়িয়ে থাকি কিন্তু সময়াভাবে আজ সে নিয়ম রাখা চলবে না। তাই অদূরে আর একটা প্রকাণ্ড থালা পড়ল। তাতে তাঁরা স্বজনবর্গ বসে গেলেন। যে অতিথি-দের সম্মান অপেক্ষাকৃত কম আমাদের ভুক্তাবশেষ তাঁদের ভাগে পড়ল। এইবার হল নাচের ফরমাশ। একজন একঘেয়ে সুরে বাঁশি বাজিয়ে চলল, আর এরা তার তাল রাখলে লাফিয়ে লাফিয়ে। একে নাচ বললে বেশি বলা হয়। যে ব্যক্তি প্রধান, হাতে একখানা রুমাল নিয়ে সেইটে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আগে আগে নাচতে লাগল, তারই কিঞ্চিৎ ভঙ্গির বৈচিত্র্য ছিল।

তার পরে বাইরে এসে যুদ্ধের নাচ দেখলুম। লাঠি ছুরি বন্দুক তলোয়ার নিয়ে আস্ফালন করতে করতে চীৎকার করতে করতে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে

তাদের মাতুনি, ওদিকে অন্তঃপুরের দ্বার থেকে মেয়েরা দিচ্ছে তাদের উৎসাহ। বেলা চারটে পেরিয়ে গেল, আমরা ফেরবার পথে গাড়িতে উঠলুম, সঙ্গে চললেন আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা।

তার পরে যখন আমাদের মোটর চলল, দুই পাশের মাঠে এদের ঘোড়-সওয়াররা ঘোড়া ছোটাবার খেলা দেখিয়ে দিলে। মনে হল মরুভূমির ঘূর্ণা-হাওয়ার দল শরীর নিয়েছে।

('পারস্যে' নামক ভ্রমণকাহিনী হইতে সংকলিত)

বাংলার নদনদী

নীহার রঞ্জন রায়

[এই নিবন্ধে লেখক বলিতেছেন—আমাদের এই বাংলাদেশকে নদনদীই যুগে যুগে ভাঙিয়া গড়িয়াছে। বাঙালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্য ও শিল্পবাণিজ্যের সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহার নদনদীর সহিত।]

বাংলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে বাংলার ছোটোবড়ো অসংখ্য নদনদী। এই নদনদীগুলিই বাংলার প্রাণ; ইহারাই বাংলাকে গড়িয়াছে, বাংলার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছে যুগে যুগে, এখনও করিতেছে। এই নদনদীগুলিই বাংলার আশীর্বাদ; এবং প্রকৃতির তাড়নায়, মানুষের অবহেলায় কখনও কখনও বোধ হয় বাংলার অভিশাপও। এই সব নদনদী উচ্চতর ভূমি হইতে প্রচুর পলি বহন করিয়া আনিয়া বঙ্গের বদ্বীপের নিম্নভূমিগুলি গড়িয়াছে; এখনও সমানে গড়িতেছে। সেই হেতু বদ্বীপ-বঙ্গের ভূমি কোমল, নরম ও কমনীয়; এবং পশ্চিম, উত্তর এবং কিয়দংশ ছাড়া বঙ্গের প্রায় সবটাই ভূতত্ত্বের দিক হইতে নবসৃষ্ট ভূমি। এই কোমল, নরম ও নমনীয় ভূমি লইয়া বাংলার নদনদীগুলি ঐতিহাসিক কালে কত খেলাই না খেলিয়াছে; উদ্দাম প্রাণলীলায় কতবার যে পুরাতন খাত ছাড়িয়া নূতন খাতে, নূতন খাত ছাড়িয়া আবার নূতনতর খাতে বর্ষা ও বন্যার বিপুল জলধারাকে দুরন্ত অশ্বের মতো, মত্ত ঐরাবতের মতো ছুটাইয়া লইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই সহসা খাত-পরিবর্তনে কত সুরম্য নগর, কত বাজার বন্দর, কত বৃক্ষ-শ্যামল প্রান্তর, কত মঠ ও মন্দির, মানুষের কত কীর্তি ধ্বংস করিয়াছে, আবার নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, কত দেশখণ্ডের চেহারা ও সুখ-সমৃদ্ধি একেবারে বদলাইয়া দিয়াছে তাহার হিসাবও ইতিহাস সর্বত্র রাখিতে পারে নাই। প্রকৃতির এই দুরন্ত লীলার সঙ্গে মানুষ সর্বদা আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই; অনেক সময়ই হার মানিয়াছে; তাহার উপর আবাব দূরদৃষ্টিহীন মানুষের দুর্বুদ্ধি সাময়িক লোভ ও লাভের হিসাব বড়ো করিয়া দেখিতে গিয়া জল-

নিকাশের এবং প্রবাহের এই সব স্বাভাবিক পথগুলির সঙ্গে যথেচ্ছাচারের ত্রুটি করে নাই, এখনও তাহার বিরাম নাই। তাহার ফলে এই সব নদনদীগুলি বন্যায়, মহামারীতে দেশকে ক্ষণে ক্ষণে উজাড় করিয়া দিয়া, অথবা সুবিস্তৃত দেশখন্ডকে শস্যহীন শ্মশানে পরিণত করিয়া মানুষের উপর প্রতিশোধ লইতে ত্রুটি করে না। প্রাচীন কালে এই নদনদীগুলির প্রবাহপথের এবং দুরন্ত প্রাণলীলার সঠিক এবং সুস্পষ্ট ইতিহাস আমাদের কাছে উপস্থিত নাই; পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক হইতে নদনদীগুলির ইতিহাস যতটা সুস্পষ্ট ধরিতে পারা যায় নানা দেশী বিদেশী বিবরণের এবং নক্শার সাহায্যে, প্রাচীন বাংলা সম্বন্ধে তাহা কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে নদনদীগুলির প্রবাহপথের যে চেহারা, তাহাদের যে আকৃতি-প্রকৃতি এখন আমাদের দৃষ্টি ও বুদ্ধিগোচর, প্রাচীন বাংলায় সেই চেহারা সেই আকৃতি-প্রকৃতি অনেকেরই ছিল না। অনেক পুরাতন পথ সরিয়া গিয়াছে, প্রশস্ত খরতোয়া নদী সংকীর্ণা ক্ষীণস্রোতা হইয়া পড়িয়াছে; অনেক নদী নূতন খাতে নূতনতর আকৃতি-প্রকৃতি লইয়া প্রবাহিত হইতেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরাতন নামও হারাইয়া গিয়াছে, নদীও হারাইয়া গিয়াছে; নূতন নদী নূতন নামে সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সব নদনদীর ইতিহাসই বাংলার ইতিহাস। ইহাদেরই তীরে তীরে মানুষ-সৃষ্ট সভ্যতার জয়যাত্রা, মানুষের বসতি, কৃষির পত্তন, গ্রাম, নগর, বাজার, বন্দর, সম্পদ, সমৃদ্ধি, শিল্পসাহিত্য, ধর্মকর্ম সব কিছুর বিকাশ। বাংলার শস্যসম্পদ একান্তই এই নদীগুলির দান। উচ্ছলিত, উচ্ছ্বসিত উদ্দাম বন্যায় মানুষের ঘরবাড়ি ভাঙিয়া যায়, মানুষ গৃহহীন পশুহীন হয়; আবার এই বন্যাই তাহার মাঠে মাঠে সোনা ফলায় পলি ছড়াইয়া, এই পলিই সোনার সারমাটি। বাঙালী তাই এই নদীগুলিকে ভয়ভক্তি যেমন করিয়াছে, ভালোও তেমনই বাসিয়াছে; রাক্ষসী কীর্তিনাশা বলিয়া গাল যেমন দিয়াছে, তেমনই ভালোবাসিয়া নাম দিয়াছে ইচ্ছামতী, ময়ূরাক্ষী, কবতাক্ষ (কপোতাক্ষ), চূর্ণী, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, মধুমতী, কৌশিকী, দামোদর, অজয়, করতোয়া, ত্রিস্রোতা, মহানন্দা, মেঘনা (মেঘনাদ বা মেঘানন্দ), সুরমা, লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র)। বস্তুত, বাংলার, শুধু বাংলারই বা কেন ভারতবর্ষের নদীগুলির নাম কী সুন্দর অর্থব্যঞ্জনাময়!

বাংলার এই নদীগুলি সমগ্র পূর্বভারতের দায় ও দায়িত্ব বহন করে। উত্তর ভারতের প্রধানতম দুইটি নদীর—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের—বিপুল নদীজলধারা, পলিপ্রবাহ, এবং পূর্ব-যুক্তপ্রদেশ,* বিহার ও আসামের বৃষ্টিপাতপ্রবাহ বহন করিয়া সমুদ্রে লইয়া যাইবার দায়িত্ব বহন করিতে হয় বাংলার কমনীয় মাটিকে। সেই মাটি সর্বত্র এই সুবিপুল জলপ্রবাহ বহন করিবার উপযুক্ত নয়। এই জলপ্রবাহ নূতন ভূমি যেমন গড়ে, মাঠে যেমন শস্য ফলায়, তেমনই ভূমি ভাঙেও, শস্য বিনাশও করে। বাঙালী ক্রোধভরে পদ্মাকে বলিয়াছে কীর্তিনাশা; পদ্মা বাঙালীর অনেক কীর্তিই নষ্ট করিয়াছে সত্য—করিবে না-ই বা কেন? গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার সুবিপুল জলধারা নিম্নভূমির সাগর-প্রমাণ বিল-হাওরের অগাধ জলরাশি। দুর্দম মত্ততার অধিকার তাহার না থাকিলে কাহার থাকিবে? এবং সেই মত্ততা নরম নমনীয় নূতন মাটির উপর। ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে ও হইতেছে। অথচ এই মেঘনা-পদ্মাই তো আবার স্বর্ণশস্যের আকর। এই পদ্মার দুই তীরেই তো বাংলার ঘনতম মনুষ্যবসতি, সমৃদ্ধ ঐশ্বর্যের লীলা। মানুষ যদি পদ্মা-মেঘনাকে বশে আনিতে না পারিয়া থাকে, সে যদি আপন দুর্বুদ্ধিবশে ইহাদের মত্ততাকে আরও নির্মম আরও দুরন্ত করিয়া থাকে তবে এই দোষ পদ্মা-মেঘনার নয়।

---

* বর্তমান নাম উত্তর প্রদেশ।

মহাপ্রস্থানের পথে

প্রবোধকুমার সান্যাল

[লেখক চলিয়াছেন কেদার-বদ্রির পথে। একদিকে যেমন দুর্গমপথের দৈহিক ক্লেশের কথা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, তেমনি হৈমবত প্রদেশের অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে।]

রাত্রে চটিওয়ালার কাছে চার আনা দিয়ে একখানি লেপ ভাড়া করতে পেরেছিলাম, সুতরাং প্রভাতকালে আর ঘুম ভাঙল না। না ভাঙবারই কথা, লেপের গরম। চেয়ে দেখি বুড়ো ইঁদুরের মতো গোপালদা আমার লেপের মধ্যে ঢুকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে নাক ডাকাচ্ছেন। অম্‌রা সিং ও কালীচরণের ধমকের চোটে তাড়াতাড়ি সবাই উঠে পড়লাম। লেপ ছাড়তেই বাইরের ঠান্ডাটা যেন চাবুক মারতে লাগল। তড়িৎগতিতে বাঁধা-ছাদা করে যখন হি-হি করতে করতে পথে নেমে এলাম তখন বেলা বেশ বেড়ে উঠেছে।

আকাশ ঘন মেঘ ও কুয়াশায় প্রায় অন্ধকার! শোনা গেল বৎসরে কোনো কোনো দিন মাত্র এ-রাজ্যে সূর্যকিরণ দেখা যায়। সম্মুখে সাদা তুষারময় পর্বতের কোলে-কোলে মেঘ ভেসে চলেছে। ঠান্ডায় পা ঠিক পড়ছে না, মাতালের মতো ছন্দোহীন হয়ে চলেছি। দাঁতের উপর দাঁত চেপে জমাট বেঁধে যাচ্ছে। ইচ্ছা করছে ছুটোছুটি করি। মুখে চোখে ছুঁচের মতো তুষারের হাওয়া বিঁধছে, লাঠিটা বাগিয়ে ধরতে পারছিনে।

পাকদণ্ডী পাহাড়ের পথ, দীর্ঘ লম্বা চড়াই নয়, গোলক-ধাঁধার মতো ঘুরে ঘুরে উপরে উঠছি। বুকের মধ্যে দম আছে প্রচুর, কিন্তু পা ক্লান্ত হচ্ছে। একটু দাঁড়িয়ে আবার উঠতে থাকি। আজ আমি আগে-আগে। ব্যথা নেই, ক্লান্তি নেই, উৎসাহহীন নই, পিছনের পথ কুয়াশায় অবলুপ্ত, সম্মুখে হিমালয়ের অনন্ত কুহেলিকা, পথের ধারে-ধারে বরফের স্তূপ জমাট বেঁধে রয়েছে, ঝরনাগুলি সাবানের ফেনার মতো গলে পড়ছে,—আজ আমি আগে-আগে। আজ আমার শরীরে ফিরে এসেছে পুরাতন শক্তি, বলিষ্ঠতা, দুরন্ত উদ্দীপনা, অপরিমেয় প্রাণলীলা। কোথায় হারিয়ে গেছে পিছনের পৃথিবী,

কোথায় বিলীন হয়েছে পশ্চাৎ-জীবনের সমাজ সংসার ও আত্মীয়-বন্ধুর দল, —আজ আমি আর বিশ্রাম নেব না, তুচ্ছ দেহের অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দেব না,—আজ বন্যার মতো অপ্রতিহত গতিতে ছুটে যাব। সমস্ত জীবন থেকে এবার পেয়েছি মুক্তি, সকল বাঁধন গেছে খুলে, লোভ মোহ স্বার্থ লোকালয়ের পথে ফেলে এসেছি, পাপ পুণ্য দুঃখ ও আনন্দের কোনো প্রশ্ন নেই। এবার নদী ছুটেছে মহাসাগরের দিকে, অন্ধকার ছুটেছে আলোয়, জীবন ও মৃত্যু ছুটেছে মহানির্বাণের পথে, মানুষ ছুটেছে স্বর্গে। বাধা আর মানব না, চলেছি স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনায়, দেহ থেকে এসেছি দেহান্তরে, আত্মাকে করেছি আবিষ্কার। আজ আমি আগে-আগে, আগে-আগে, ছুটে ছুটে......

একবার দাঁড়ালাম। ছুটতে-ছুটতে সকলকে পিছনে ফেলে এসেছি। চারিদিকে অকূল কুয়াশার মধ্যে সঙ্গীরা কে কোথায় হারিয়ে গেছে, কেবল দেখা যাচ্ছে দুইদিকের সামান্য পথরেখা। কোথাও বৃক্ষলতা নেই, বন অরণ্য নেই, জীব-জানোয়ারের চিহ্নমাত্র নেই, শুধু তুষারময় পর্বতমালা, অসংখ্য ঝরনা চীৎকার করতে করতে পথের ধারে নেমে আসছে। বামে দক্ষিণে সম্মুখে পিছনে মেঘের ঘনঘটা, বিলুপ্ত আকাশ, নিশ্চিহ্ন পৃথিবী। এবার চলছি হাতড়ে-হাতড়ে, গর্জনমত্ত বায়ুবেগে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছিনে। ক্রমে ক্রমে আলো প্রখর হয়ে উঠল। সে-আলো আকাশের নয়, রৌদ্রের দীপ্তির নয়,—বিদ্যুৎ-বহ্নির নয়,—সে এক নতুন অলৌকিক আলো—তুষার-শুভ্রতার তীব্র তীক্ষ্ন আলো। আলোর স্রোত, আলোর সমুদ্র, আলোকধাঁধা। চোখের দৃষ্টি উগ্র যন্ত্রণায় বুজে এল, চোখ জুড়ে বন্ধ হয়ে গেল। চোখে হাত চাপা দিয়ে অন্ধের মতো সংকীর্ণ পথরেখার উপরে পা বুলিয়ে-বুলিয়ে হাঁটছি। সে কী ভয়ানক সর্বনাশা আলোকের উগ্রতা, তীরের মতো চোখে এসে লাগে, যাত্রীরা পথভ্রষ্ট হয়ে হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়ে যায়! দেখতে-দেখতে আবার নূতন উপসর্গ দেখা দিল। উঠল ঝড়, ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে শিউলি ফুলের মতো তুষারবৃষ্টি, তার সঙ্গে দানা-দানা জল। কী কঠিন ঠাণ্ডা! আঃ, আর বুঝি আত্মরক্ষা হল না, আর কতদূর আছে কে জানে, মন্দির—আর কতদূরে? মাথার উপরে পড়েছে বরফ, কাঁধে পড়েছে বরফ,

কম্বলটা বরফে সাদা হয়ে গেল, চোখে চাপা দিয়েও চোখ খুলতে পারছিনে, পাগলের মতো ছোটবার চেষ্টা করলাম।

আঁক!

পড়লাম পা পিছলে বরফের উপরে, পথ তুষারে ডুবে গেছে। একি, সত্যিই কি আমার শরীরে আর শক্তি নেই? শরীর পাথরের মতো অসাড় হয়ে আসছে কেন? এ কোথায় ছিট্‌কে পড়েছি? হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কম্বলটা খুঁজে পেলাম। আহা বেচারি, কী দুঃখই সইল আমার জন্য! কত নীচে পড়েছি বোঝা গেল না, অনেক চেষ্টা করে চোখের পল্লব একটু খুলে দেখি, পাশেই একটা ছোট্ট জলাশয় ঠান্ডায় জমে আয়নার কাচের মতো কঠিন হয়ে গেছে। গা-ঝাড়া দিয়ে আবার উঠলাম, মিছরির ঢিবির মতো বরফের স্তূপে পা পুঁতে গেছে। লাঠিটা আছে খাড়া দাঁড়িয়ে বরফের মধ্যে। যাক্‌ এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। কোমর পর্যন্ত ঠান্ডা উঠে পক্ষাঘাত হয়েছে, ঊর্ধ্ব-দেহটা কেবল বাকি। নিজেকে টানতে টানতে এগোচ্ছি, চোখ খুলতে পারলে দেখতাম আর কত দূরে! চোখে মুখে পড়েছে তুষার ও জলের বিন্দু, মাথার চুল ভারী হয়ে উঠেছে, পরনের গৈরিক-সজ্জা মোলায়েম তুষারে আচ্ছন্ন হল। মিট্‌মিট্‌ করে একবার তাকাবার চেষ্টা করলাম। সম্মুখে তুষারের পুষ্পবৃষ্টি রূপার ঝালরের মতো ঝলমল করছে, মাথার উপরে তুষারের চন্দ্রাতপ। কী অনির্বচনীয় রূপগৌরব! এ যেন কোন্‌ বিরাটের পদতল ছোঁবার জন্য উঠছি, যেন এক বিপুল বিশ্বের তোরণ-দ্বারে করাঘাত করবার জন্য পাগলের মতো, অন্ধের মতো হাতড়ে চলছি—যেন স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের আজ আলিঙ্গন হবে।

শঙ্খধ্বনি শুনছি। কাঁসর-ঘণ্টার বুঝি আওয়াজ আসছে! কোন্‌ দিকে? উত্তরে, না দক্ষিণে? আবার কান পেতে শুনলাম। কিন্তু আর যে চলতে পারছিনে, একটিবার শুয়ে পড়ে বিশ্রাম নেব? কিন্তু শুলেই যে থামতে হবে, অন্তিম মুহূর্তের থামা। প্রাণের মধ্যে ধীরে-ধীরে তলিয়ে যাচ্ছি, সব ডুব দিচ্ছে,--রূপ, আলো, শব্দ, চেতনা, নিশ্বাস,—সব।—হাত-পাগুলো আর কথা শুনতে চাইছে না! একবার চীৎকার করে কাঁদতে পারিনে? একবার পারিনে ঝড়ের মতো হেসে উঠতে?

'মহারাজ-জি, কেঁও খাড়া হুয়া হ্যায়?'—হাতের উপরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে সজাগ হয়ে উঠলাম। হাতটা ধরে হিড়-হিড় করে কয়েক পা টেনে নিয়ে গিয়ে লোকটি বললে, 'এ্যায়সা হোতা হ্যায় ঠণ্ডেমে, জল্‌দি-জল্‌দি আনা—'

'কোন্‌ হ্যায় তুম্‌, ছাড়ো ছাড়ো—'

'আও জি, আঁখ্‌ খুলো, ম্যায় অম্‌রা সিং হ্যায়। আও, পুল আ গৈ।'

—অম্‌রা সিং আমাকে টেনে নিয়ে চলল।

শরীরের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে চোখের পাতা মেলে একবার তাকালাম। তখন মন্দাকিনী-দুধগঙ্গার পুলের কাছাকাছি এসে গেছি। কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ অদূরে আবার শোনা গেল। দু'চারজন যাত্রী দূরে ছায়ার মতো নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। পুল পার হয়েই সামান্য লোকালয় ও কয়েকটা পাথরের ঘর, দু'একটি দোকান, পথগুলি পাথর-বাঁধানো। ঘর-দুয়ার, দোকান-পাট, পথ-ঘাট সমস্ত কঠিন বরফের স্তূপে ঢাকা। তার উপর দিয়েই আনাগোনা চলছে। খবর নিয়ে জানলাম গোপালদার দল এখনো অনেক পিছনে।

পথ ঘুরেই সম্মুখে তুষারময় হিমালয়ের পটভূমিকায় কেদারনাথের মন্দির দেখা গেল। সম্মুখে প্রস্তরময় বেদিকার উপরে পথের দিকে পিছন ফিরে বিরাট পাথরের ষাঁড় উপবিষ্ট। চোখে বরফের আলো এতক্ষণে একটু সয়ে গেছে, এবারে আর তেমন কষ্ট হচ্ছে না। এবারে হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি আঙুলের ডগাগুলো ঠাণ্ডায় ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে, পায়ের চামড়া ফেটে গেছে। তা যাক, বাইরে পাদুকা ত্যাগ করে এই পরম রূপবান মন্দিরের ঘনান্ধকার অন্দরে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করলাম। ভিতরে তখন জনকয়েক অর্ধ-উন্মত্ত স্ত্রী-পুরুষ যাত্রী কেদারনাথের বিপুল দেহের উপর ওলট-পালট খাচ্ছে। কেদারনাথ মূর্তিমান নন, কর্কশ অসমতল বড়ো একখানা পাথরের খণ্ড,—তা হোক, তাকেই আলিঙ্গন করে কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, কেউ চীৎকার করছে, কেউ ধরেছে গান, কেউ করছে আর্তনাদ ও করুণ মিনতি, কেউ বা শীতবিদীর্ণ রক্তাক্ত মুখে তাকে পাগলের মতো চুম্বন করছে! আবেগ, উত্তেজনা, উল্লাস, আর্তস্বর, পূজাপাঠ, স্তব-মন্ত্র, স্নেহ-ভালোবাসা, ভক্তি ও আনন্দ,—কিন্তু স্থাণু ও বধির প্রস্তরস্তূপ অচঞ্চল নীরবতায় তেমনি করেই পড়ে রইল। ভিতরটায় কালিবর্ণ অন্ধকার ও কঠিন অসহ্য প্রাণান্তিক ঠাণ্ডা, পা

পেতে দাঁড়াবার উপায় নেই; সম্মুখে এই পথশ্রান্ত পাগলের দল আত্মহারা হয়ে কোলাহল করছে। কী যেন ভেবে অন্ধকারে একবার নিঃশব্দে দাঁড়ালাম।

কিন্তু ভিতরের হিমগর্ভ অন্ধকারের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই, ঠাণ্ডায় মুহূর্তে-মুহূর্তে সর্বশরীর অসাড় হয়ে আসে, গায়ের রক্ত জমাট বেঁধে যায়, গলার ভিতর থেকে একরকম ভগ্ন, আর্ত আওয়াজ বিদীর্ণ হয়ে ছোটে। এদিকে ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত যাত্রীদের প্রলাপ,—কারো মুখের কস্ বেয়ে গড়াচ্ছে রক্ত, কারো ফেনা, হাতে-পায়ে হিমক্ষত, রক্তের দাগ, সর্বাঙ্গে তুষারের চূর্ণ, কারো-কারো কণ্ঠস্বর বসে গেছে,—কিন্তু কেন? দুর্গমের এই বীভৎস পীড়নের ভিতর দিয়ে কোন্ দুর্লভকে তারা বরণ করতে এসেছিল? মন্দিরের অন্দরে প্রেতের মতো একাকী কিয়ৎক্ষণ টহল দিয়ে বেড়ালাম। ভিতরটা চির-অন্ধকার, ভয়ের বাসা, রহস্যের পাথার, সূচ্যগ্র পরিমাণ আলোক-প্রবেশের পথ কোথাও নেই। কী বলব, কী প্রার্থনা জানাব? এই নির্বোধ প্রস্তর-স্তূপের সুমুখে দাঁড়িয়ে কাঙালপনা প্রকাশ করব—সে যে ভয়ানক ছেলেমানুষি। অথচ একজন পথশ্রান্ত সামান্য তীর্থযাত্রী, সেইটুকুই তো আমার শেষ পরিচয় নয়: আমি যে ক্ষুদ্র, আমি যে নগণ্য—এই কথাই বা অনুভব করি কোন্ সংকীর্ণতায়? আবেগ দিয়ে, আনন্দ দিয়ে, বিশ্বাস ও প্রেম দিয়ে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা এই যে মাটি আর পাথর, এর পাশে এসে দাঁড়িয়ে নিজেকে যদি ছোটো করে ভাবতে না পারি, সে কি নিতান্তই অহমিকা? দেবতার কাছে এসে দাঁড়ালেই যে আমি আপন দেবত্বকে অনুভব করি।

খোকাখুকি



অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আদরপুরের রাজার ঘরে মানুষ হয় খোকা; আর খুকি—সে মানুষ হয় অনাদরপুরের কাঙালের ঘরে! সে কাদের খোকা, কাদেরই বা খুকি তা তো জানতে পারছি নে, শুধু দেখতে পাচ্ছি—খোকা আছেন রাজার হালে, সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে দুধিভাতি খেয়ে; আর খুকি—সে রয়েছে উপবাসে ছেঁড়া কাঁথায়, ভিজে মাটির উপর!

ঠাকুর পাঠিয়েছিলেন খোকাখুকি দুজনকেই এই পৃথিবীতে দুটি রূপের ফুল হয়ে ফুটে উঠতে আপনা আপনি: কিন্তু রাজাটা ভাবলে, আদর না পেলে যত্ন না পেলে ছেলের বাঁচা মুশকিল—ফুলকে নিয়ে সে সোনার কৌটোতে ভরে রাখলে। আর কাঙাল—সে গোড়া থেকেই ভেবে নিলে ফুল তো শুখোবেই, কাজেই মেয়ের মরা-বাঁচার ভাবনাই সে ছেড়ে বসল একেবারে গোড়া থেকে!

গামলার গাছে গোলাপফুল যেমন বাড়ে তেমনি বাড়তে থাকল রাজপুত্তুর আর পাঁকে পড়ে পদ্ম যেমন বাড়ে, তেমনি বাড়তে থাকল দিনে দিনে কাঙালিনী কন্যা। একেও দেখে লোকে বলে আহা, ওকেও দেখে লোকে করে আহা। কিন্তু রাজার ছেলে যখন আবদার করে তখন তার মন যোগাতে লোকে পথ পায় না—গাঁঠের কড়ি খরচ করে অকাতরে, যার গাঁঠ কাটা গেছে সে-ও ধার করে রাজপুত্তুরকে খুশী করতে চলে। আর কাঙালিনী সে মুষ্টিভিক্ষে চেয়ে দুয়োরে দুয়োরে ঘোরে—কোনো দিন পায় দুমুঠো ক্ষুদ, কোনো দিন পায়ও না! যে দিন বা পায়, সে দিন চোখের জলের নুন দিয়ে সে ভিক্ষের চাল একটু একটু করে ভিজিয়ে খায়।

মড়ক আসে,—সে আদরপুরেও আসে, অনাদরপুরেও আসে! আঁচিল পাঁচিল ঘেরা সাতমহলের মাঝ থেকে এক রাতে রাজপুত্রের সাত বোনকে নিয়ে চলে যায় সব বাধা ঠেলে! কাঙালের ঘরে তার আসার কোনো বাধা নেই, তবু সে আসে, কিন্তু খুঁজে পায় না কাকে নেবে। কাঙালিনী কন্যাকে কাঁদিয়ে তার পোষা এতটুকু পাখিটাকে মেরে চলে যায়!

পাখির প্রাণ আর সোনার খাঁচায় ধরা রাজকন্যাদের প্রাণ বাতাস ধরে ভাসতে ভাসতে চলে যায়—বিষ্টির মেঘের আড়াল দিয়ে, আপন জনকে ডাকতে ডাকতে, চোখ-ভেজানো বুক-ফাটানো সুরে!

রাজপুত্র হন রাজকন্যাদের জন্যে থেকে থেকে আনমনা, অমনি তাঁকে ভোলাতে আসে নতুন নতুন খেলনা, নীলার ময়ূর, সোনার টিয়ে, শিকলবাঁধা বাঘের ছাঁ, হাঁস, ঘোড়া কত কী! দুধ আসে, ক্ষীর আসে, মতিচুর আসে, মিহিদানা আসে—রাজপুত্র ভুলে যায়, আবার ভোলেও না! আর কাঙালের মেয়ে, তার আনমনা হবার সময় নেই—সে নিয়মিত ভিক্ষে করে বেড়ায়, আর কাঁদে পাখির জন্যে! লোকে বলে—মেয়েটা মায়া-কান্না কাঁদছে, বেশি করে ভিখ্ পাবে বলে।

ঠাকুর থাকেন বসে টল-সমুদ্রের কিনারায়, পায়ের তলায় তাঁর অপার জল টলটল করে, জীবননদী সমস্ত দিনরাত গড়িয়ে চলে ঠাকুরের পা ধুয়ে অকূল সাগরে মিলতে! ঠাকুরের হাতে একখানি পদ্মপাত, তারি মাঝে টলটল করে জগৎ-সংসার—একটি ফোঁটা জলবিন্দু! সেই পদ্মপাতায় ধরা জলবিন্দুর পাশে আর একটি ছোটো ফোঁটা এসে লাগল, যেন কার চোখের জলে গড়া একটি মুক্তো! ঠাকুরের দৃষ্টি—যেমন করে শিশিরের উপর পড়ে সকালের আলো—তেমনি পড়ল এতটুকু জলের ফোঁটায়!

ওদিকে আদরপুরে সকাল থেকে রাজপুত্রের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। রাজবেশ পড়ে আছে ধুলোয়—সোনার পালঙ্ক শূন্য! লোক ছুটল চারিদিকে, সৈন্য ছুটল, সামন্ত ছুটল, খুঁজল সবাই রাজ্যে রাজ্যে—পেলে না! যদি শিকারে গিয়ে থাকেন—বনে বনে খুঁজলে, কোথাও নেই! বিদেশে যদি গিয়ে থাকেন—দেশবিদেশ খুঁজলে, সন্ধান হয় না রাজপুত্রের। আদরে-মানুষ রাজার ছেলে, অনাদরপুরে সে যে যেতে পারে, এ কথা কারো মনেই এল না!

অনাদরপুরে গোধূলির বেলা নবীন ভিখারী একতারা বাজিয়ে চলেছে—ঘরে ঘরে দুয়োর ভেজানো দেখে। চলতে চলতে এসে দাঁড়ায় ভিখারি কাঙালিনীর পাশে—গান গায় ভিখারি, ভিক্ষা দেয় কাঙালিনী—চোখের জলে ভেজা একটুখানি আদর!

ঠাকুরের হাতে পদ্মপাতায় পাশাপাশি দুটি জলের ফোঁটা এক হয়ে মেলে—শুক-তারা আর যেন সন্ধ্যা-তারা।

উত্তরমেরু অভিযান

কালিদাস রায়

একশ্রেণীর জ্ঞানগুরুগণ গৃহে বা আশ্রমে বসিয়া গ্রন্থশালা কিংবা পরীক্ষাগারে গবেষণা করিয়া অবিরত সাধনার দ্বারা জগতের জ্ঞানসম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। আর একশ্রেণীর জ্ঞানবীরগণ দূরদূরান্তরে পৃথিবীর অজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত পথের পথিক হইয়া জ্ঞান আহরণ করিয়া আনিয়া জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। মানুষকে কিছুতেই প্রবেশাধিকার দিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিকূল প্রকৃতি যেখানে সহস্র বাধা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল ইঁহারা সেখানে অবিরত সংগ্রাম করিয়া প্রবেশলাভের চেষ্টা করিয়াছেন। এই বীরব্রতে কেহ-বা জয়ী হইয়াছেন, কেহ-বা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, কেহ-বা পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া অন্য-কোনো দুঃসাহসী বীরকে ব্রতভার সমর্পণ করিয়া উদ্‌যাপনের প্রতীক্ষায় অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়াছেন। এই দুঃসহ দুঃখস্বীকার, এই অমানুষিক কৃচ্ছ্রসাধন, এই তিলে তিলে প্রাণোৎসর্গ কিসের জন্য? এই অসাধ্যসাধন সত্যের আবিষ্কারের জন্য, জগতের জ্ঞানসম্পদ বাড়াইবার জন্য, প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য—সর্বোপরি নিয়তির মতো নিষ্ঠুর প্রকৃতিকে জয় করিয়া মানুষের পৌরুষের গৌরব বৃদ্ধির জন্য।

মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না—মেরুপ্রদেশে, উচ্চতম পর্বতের শিখর-দেশে, কোনো কোনো নদীর সূতিকাগারে ও বিষুবমণ্ডলের গভীর অরণ্যানীতে। আজ বীর অভিযাত্রীরা সর্বত্রই প্রবেশ করিয়া জয়ধ্বজা উড়াইয়াছে। এখানে আমি শুধু দুই অভিযাত্রীর উত্তরমেরু অভিযানের কথা বলিব।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমেরিকাবাসীরা উত্তরমেরু দিয়া সহজে চীনে পৌঁছিয়া বাণিজ্য চালাইবার আশা পোষণ করিতেন। এই পথ আবিষ্কারের জন্য প্রথম যাত্রা করেন হেন্‌রি হাড্‌সন। তিনি মেরুপ্রদেশে পৌঁছিতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি হিমমণ্ডলের কোনো কোনো দ্বীপ, প্রণালী, উপসাগর ইত্যাদি আবিষ্কার করেন।

তারপর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ন্যানসেন নামক একজন নরওয়েবাসী নাবিক ২৭ বৎসর বয়সের সময় সুমেরুর দিকে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে লইলেন শ্লেজগাড়ি, কিছু খাদ্য, পাঁচজন সঙ্গী এবং বরফের উপর দিয়া চলিবার স্কী নামক কাঠের জুতা। এই যাত্রায় তিনি গ্রীনলণ্ডের পূর্ব উপকূল হইতে পশ্চিম উপকূলে পৌঁছিলেন। এই গ্রীনলণ্ড প্রায় আফ্রিকার মতো বিরাট একটি মহাদেশ, কিন্তু সারা বৎসর বরফে আবৃত থাকে বলিয়া সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে এস্কিমো ছাড়া এখানে অন্য কোনো লোকের বাস নাই। উত্তরমেরুতে পৌঁছিতে না পারিয়া ন্যানসেন গ্রীনলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

তিনি কিন্তু দমিবার পাত্র ছিলেন না, তিনি আবার কয়েক বৎসর পরে যাত্রা করিলেন। এবার তিনি এমন একখানি জাহাজ তৈয়ারি করাইলেন যাহা বরফের চাপে বা আঘাতে ভাঙে না। সঙ্গে পাঁচ বৎসরের মতো খাদ্য ও বারোজন লোক লইলেন। মেরুপ্রদেশে প্রবেশ করিয়া বরফের ভাসন্ত পাহাড়ে তাঁহার জাহাজ আটকাইয়া গেল। বরফের পাহাড় ভাসিতে ভাসিতে চলিল—তাহাই তাঁহার জাহাজকেও ঠেলিয়া লইয়া চলিল। এইভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি দেখিলেন জাহাজের গতি বড়োই মন্থর। এইভাবে বরফের সঙ্গে ভাসিয়া যাইতে হইলে মেরুতে পৌঁছিতে তাঁহার বহুকাল লাগিবে। তখন তিনি জাহাজ ছাড়িয়া বরফের উপর দিয়া হাঁটিয়া মেরুর দিকে চলিলেন। সঙ্গে থাকিল কিছু খাদ্য, একজন সহচর, ২৮টি তুন্দ্রাভূমির কুকুর, শ্লেজগাড়ি ও এস্কিমোদের তৈয়ারি চামড়ার নৌকা।

এইভাবে বীর ন্যানসেন চলিলেন সুমেরু-বিজয়ে। এইভাবে বরফের মধ্য দিয়া চলা যেমন কষ্টকর, তেমনি বিপৎসংকুল। মাঝে মাঝে ফাটল আছে, অতি সাবধানে এই ফাটল এড়াইয়া চলিতে হয়। নতুবা একেবারে অতল জলে তুষারসমাধি। যেখানে ফাটল খুব বিস্তৃত সেখানে চামড়ার নৌকার সাহায্যে তিনি পার হইতে লাগিলেন। বরফের উপর দিয়া গতি হয় অতি মন্থর—ক্রমে খাদ্য ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, তখন তাঁহারা দুইজনে সঙ্গের এক-একটি করিয়া কুকুর মারিয়া খাইতে লাগিলেন। কী ভীষণ অমানুষিক সাধনা! ভাবিতে সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

বীর অভিযাত্রী—আপনার ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য কী কঠোর তপস্যাই না

করিতে লাগিলেন! ক্রমে তিনি দেখিলেন, যেভাবে তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে মেরুকেন্দ্রে উপস্থিত হইতে এখনো দুই মাস লাগিবে; অন্তত দুইশত মাইল তখনও বাকি—এদিকে বাকি কুকুরগুলিতে দুই সপ্তাহ কাল চলিতে পারে। আগাইলে মরণ সুনিশ্চিত ভাবিয়া ন্যানসেন দুইশত মাইল দূর হইতে জাহাজে ফিরিয়া আসিলেন। দুই বৎসর পরে ন্যানসেন সুমেরু-কেন্দ্রের কাছাকাছি গিয়াছিলেন। তিনিই মেরুমণ্ডলের আকাশের অদ্ভুত আলোক-লীলার কথা দেশে আসিয়া প্রচার করেন। মেরুমণ্ডলের বহু কথা তাঁহার অভিযান হইতে ইউরোপ জানিতে পারে।

লেফ্‌টেনান্ট এডউইন পিইরি ছিলেন একজন আমেরিকান আবিষ্কারক। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—মেরু-কেন্দ্র আবিষ্কার করিবেনই। তিনি এজন্য অনেক দিন হইতেই প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি গ্রীনলণ্ডে এস্কিমোদের মধ্যে গভীর শীতে কিছুকাল বাস করিয়া তুষাররাজ্যের সকলপ্রকার ক্লেশস্বীকার অভ্যাস করিয়াছিলেন। বরফের উপর দিয়া অতি দ্রুতবেগে বহু মাইল অনাহারে অনিদ্রায় চলার অভ্যাসও তাঁহার হইয়াছিল। এস্কিমোরা তাঁহাকে খুবই ভালোবাসিত। তাই জীবন বিপন্ন করিয়াও তাহারা তাঁহার সহিত মেরুস্থানে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বহু চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' সংকল্প করিয়া যাত্রা করেন। পথে ভাসন্ত হিমশৈলের আঘাতে তাঁহার জাহাজের তলা ভাঙিয়া গেল। সেই সঙ্গে তাঁহার একটি পা-ও ভাঙিয়া গেল। সেই ভাঙা পা লইয়া এস্কিমোদের কাঁধে চড়িয়া তিনি গ্রীনলন্ডে আশ্রয় লইলেন। সেখানে বরফের ঘরে শীত কাটাইয়া ৫।৭ দিন বরফের উপর দিয়া চলিয়া গ্রীনলণ্ডের উত্তর-পূর্ব উপকূলে পেঁৗছিলেন। তারপর তিনি মেরুর দিকে যাত্রা করেন। তখন মেরু-অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন রাত্রি চলিতেছে। দুই ঘণ্টা মাত্র চাঁদের আলো পাওয়া যাইত। কাজেই অন্ধকারে হাতড়াইয়া পথ চলিতে হইত। চলিতে চলিতে দেখেন তাঁহার পায়ের আঙুলগুলি অসাড় হইয়া গিয়াছে। আর আগানো চলে না। তখন ২৫০ মাইল হাঁটিয়া জাহাজে পেঁৗছিলেন। দেশে ফিরিয়া পায়ের সাতটি আঙুলের অগ্রভাগ তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আর একবার তিনি চেষ্টা করেন। এবার মেরুকেন্দ্রের দুইশত মাইলের কাছে আসিয়াছিলেন। কিন্তু খাদ্য ফুরাইয়া যাওয়ায় ফিরিতে হইল। ফিরিবার পথে দেখেন—বরফপ্রান্তর ভাঙিয়া একটি প্রকান্ড নদী তাঁহার সম্মুখে। পার হইবার কোনো উপায় নাই। খুঁজিতে খুঁজিতে একটি সংকীর্ণ অংশে খুব পাতলা বরফের একটা সরু সাঁকো দেখা গেল। তাহার উপর দিয়া অতি সন্তর্পণে তিনি পদবিক্ষেপ করিয়া পার হইয়াছিলেন।

এত বিপদেও তিনি সংকল্প ত্যাগ করিলেন না। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আবার তিনি দুঃসাধ্যসাধনে যাত্রা করিলেন। এবার তিনি মেরুকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া সেখানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা প্রোথিত করিলেন।

পিইরি বার বার চেষ্টার ফলে বুঝিয়াছিলেন—মেরুতে পৌঁছিতে হইলে গ্রীষ্মকালে যাত্রা করিয়া গভীর শীতে মেরুতে আসিয়া পৌঁছানো চাই। তাহার কারণ, গভীর শীতে সমস্ত পথটি কঠিন বরফে জমাট হইয়া থাকে—কোথাও বরফ গলিয়া বা ভাঙিয়া মহাসাগরের জলরাশিকে উন্মুক্ত করিয়া গতিরোধ করে না। অথচ শীতকালই মেরুর পক্ষে ভীষণতম। শীতকালে সূর্যোদয় তো হয়ই না—চাঁদের আলোও প্রতি রাত্রে ২।৩ ঘণ্টার বেশি সময় থাকে না। পিইরি গভীর শীতের অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া মেরুতে পৌঁছিয়াছিলেন। গ্রীনলন্ড ছাড়াইয়া মেরুমন্ডলে কোনো স্থল নাই—সমস্তই মহাসাগর—তুষারে ঘনীভূত মহাসাগর। কাজেই জাহাজ চলে না—মহাসাগরের জলের উপরে তুষারের আস্তরণের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। মেরুকেন্দ্রে ভূতলে বরফ ছাড়া কিছু নাই—আকাশে চন্দ্র, সূর্য ও মেরুজ্যোতির অপূর্ব বর্ণচ্ছটা ছাড়া নূতন কিছুই নাই। তবু প্রকৃতির সর্ববাধা অতিক্রম করিয়া সংগ্রাম করিয়া তাহাকে পরাজিত করায় একটা গৌরব ও আনন্দ আছে। তাহাই লাভ করিবার জন্য মেরুযাত্রী বীরগণ এইরূপ দুশ্চর তপস্যা করিয়াছেন।

আমরা ইতিহাসে আলেকজান্দার, দরায়ুস, নেপোলিয়ন ইত্যাদি মহাবীরের কথা পড়িয়া থাকি। তাঁহারাও এই অভিযাত্রীদের মতো বীর নহেন। তাঁহারা দুঃখ স্বীকার করিয়াছেন যতটুকু তাহার সহস্রগুণ দুঃখ দিয়াছেন মানব-

জাতিকে। আর তাঁহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্বার্থকে ছাড়াইয়াও যায় নাই। কিন্তু এই আদর্শ বীরগণ সাধ করিয়া সমস্ত দুঃখ বরণ করিয়াছেন, মানুষকে কোনো দুঃখ দেন নাই। সমগ্র জগৎকে তাঁহারা দিয়া গিয়াছেন কৃচ্ছ্রসাধনায় অর্জিত দুর্লভ জ্ঞানসম্পদ, সত্যের সন্ধান, বীরব্রতের চরম আদর্শ, সর্বদুঃখজয় ও মৃত্যুজয়ের মহামন্ত্র।

ভারতের প্রকৃতি

প্রমথ চৌধুরী

[লেখক সরল ভাষায় ভারতবর্ষের প্রকৃতির পরিচয় সংক্ষেপে দিতেছেন। এই ভারতবর্ষ ভূখণ্ডের মধ্যে এখনকার ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান দুইই অন্তর্ভুক্ত।]

প্রথমত ভারতবর্ষ হচ্ছে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। তবে উত্তরাপথের সঙ্গে দক্ষিণাপথের এ বিষয়েও একটু প্রভেদ আছে। তোমরা বোধ হয় গ্লোবে লক্ষ্য করেছ যে পিপের গায়ে লোহার পৎরার বাঁধনের মতো কতকগুলি কালো কালো রেখা এই গোলকটির দেহ বেষ্টন করে আছে।...মধ্যে বিষুবরেখার উত্তরে যে রেখাটি আছে, সেটির নাম ট্রপিক অব ক্যান্সার আর বিষুবরেখার দক্ষিণে যেটি আছে, তার নাম ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকরন।

সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর বিশেষ একটি যোগ দেখাবার জন্য এ দুটি রেখা আঁকা হয়েছে। এই রেখাস্থিত জায়গাতেই সূর্যের কিরণ পৃথিবীর উপর ঠিক খাড়া হয়ে পড়ে—অপর সব স্থানে তেড়চা ভাবে। এই ট্রপিক অফ ক্যান্সারের উত্তর দেশ শীতের দেশ, আর ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকরনের দক্ষিণ দেশও শীতের দেশ।

আর এই রেখাদ্বয়ের মধ্যের দেশ সব গরম দেশ। ভারতবর্ষের উত্তরাপথ প্রায় সমস্তটাই ট্রপিক অফ ক্যান্সারের উত্তরে ও দক্ষিণাপথ আগাগোড়া তার নীচে। ফলে দক্ষিণাপথে শীত ঋতু বলে কোনো ঋতু নেই। জনৈক ইংরেজ বলেছেন যে দক্ষিণাপথ হচ্ছে নয় মাস গরম বাকি তিন মাস আরো গরম। উত্তরাপথে কিন্তু শীত গ্রীষ্ম দুইই বেশি। দক্ষিণাপথে গ্রীষ্মকাল উত্তরাপথের মতো অসহ্য হয় না, তার কারণ দক্ষিণাপথ উত্তরাপথের চাইতে প্রথমত উঁচু, দ্বিতীয়ত তার তিনদিক সমুদ্রে ঘেরা।

তারপর ভারতবর্ষের এই দুভাগের মাটিও এক জাতের নয় এবং তাদের

গুণাগুণও পৃথক। মানুষের পৃথিবীর সঙ্গে কারবার প্রধানত মাটি নিয়ে। গাছপালা-তৃণশস্য সব মাটিতেই জন্মায়।

এ সত্ত্বেও আমাদের জানা উচিত যে, মাটি হচ্ছে পৃথিবীর চামড়া, ও চামড়ার নীচে পাথর আছে, যে পাথর থেকে কিছুই জন্মায় না,—জীবজন্তুও নয়, গাছ-পালাও নয়। মা বসুন্ধরা অন্তরে অন্তরে পাষাণী।

পৃথিবীর মাটিও পাথরের বিকার মাত্র। হয় পাথরকে পুড়িয়ে বা গুঁড়িয়ে না হয় গলিয়ে মাটি তৈরি করতে হয়। জলের কাজ হচ্ছে পাথরকে চূর্ণ করা, ও অগ্নির কাজ হচ্ছে তাকে দ্রব করা।

পাহাড় থেকে নদ-নদী বেরয়, পাহাড় ভেঙে। আর তারা যে চূর্ণ পাষাণ বয়ে নিয়ে আসে, তাই দিয়ে যে মাটি গড়ে, সেই মাটিকে আমরা পলিমাটি বলি। সেই মাটিই প্রধানত গাছপালার জন্মভূমি। আর সমগ্র উত্তরাপথ প্রায় এই মাটিতেই তৈরি।

আমরা ভারতবর্ষকে উপদ্বীপ বলি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের ত্রিকোণ দক্ষিণাংশই একটি উপদ্বীপ। এ অংশ অতি পুরাকালে একটি দ্বীপ মাত্র ছিল। হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যের দেশ তখন ছিল জলমগ্ন। তারপর সেই জলমগ্ন দেশ যখন হিমালয়ের নদ-নদীর কৃপায় উত্তরাপথ হয়ে উঠল, তখন তার দক্ষিণ দ্বীপ উত্তরাপথের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ নামক মহাদেশ সৃষ্টি করলে। দক্ষিণাপথ উত্তরাপথের চাইতে ঢের প্রাচীন দেশ। তোমরা যখন ভূগঠনতত্ত্ব পড়বে, তখন এ দেশের গাছ-পাথরের বয়সের হিসাব পাবে।

দক্ষিণাপথের বেশির ভাগ মাটি পলিমাটি নয়, অর্থাৎ নদ-নদীর দান নয়। আগ্নেয়গিরি হতে যে গলা পাথরের উদ্গম হয়েছে, তাই হচ্ছে দক্ষিণাপথের মাটি। উত্তরাপথ বরুণ দেবতার সৃষ্টি, দক্ষিণাপথ অগ্নিদেবতার। এই দুই মাটি এক জাতের নয় এবং এ দুয়ের ধর্ম এক নয়।

এ দুই দেশের জলবায়ুও বিভিন্ন। মেঘ আসে সমুদ্র থেকে, আর পবনদেবই মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে আসেন। সুতরাং কোন্ দেশে কত বৃষ্টি হয় তা নির্ভর করে কোন্ দেশে, কোন্ দিক থেকে কী বাতাস বয়, তার উপর। সিন্ধুদেশ হচ্ছে অনাবৃষ্টির ও আসাম অতিবৃষ্টির দেশ। এর মধ্যবর্তী দেশ

পরিমিত বৃষ্টির দেশ। অপর পক্ষে দক্ষিণাপথের পশ্চিম উপকূল অতিবৃষ্টির দেশ ও তার পূর্ব অংশই অনাবৃষ্টির দেশ।

যে বায়ুকে আমরা মৈসুম (monsoon) নামে আখ্যাত করি তার চলবার পথ হচ্ছে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে। এ বাতাস প্রথমে মালাবার দেশকে জলে ভাসিয়ে দেয়, তারপর পশ্চিমঘাটে বাধা পেয়ে ঘুরে এসে বাংলায় ঢোকে, তখন তার গতি হয় দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিমে। এই বাতাস বাংলা আসামের গায়ে প্রচুর জল ঢেলে দিয়ে তারপর উত্তরাপথের অন্তরে গিয়ে প্রবেশ করে। গ্রীষ্ম ঋতুর অবসানেই এ দেশে বর্ষা ঋতু দেখা দেয়। মৈসুম কিন্তু পঞ্চনদ পর্যন্ত ঠেলে উঠতে পারে না। এজন্য বাংলায় যখন বৃষ্টি হয়, পাঞ্জাব তখন শুখনো, পাঞ্জাবে শীতকালেই বর্ষাকাল।

ভারতবর্ষের লোক শতকরা ৯০ জন কৃষিজীবী। এই কারণে ভারতবর্ষ নাগরিক দেশ নয়, গ্রাম্য দেশ। এ দেশে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গ্রাম আছে, আর পঁচাত্তরটিও নগর নেই। নগরে একরকম সভ্যতার সৃষ্টি হয়, যেমন হয়েছিল পুরাকালের গ্রীসের আথেন্স ও ইতালির রোম নগরীতে, আর সেই সভ্যতাই কতক অংশে বর্তমান য়ুরোপের মনের উপর প্রভুত্ব করেছে। এই শহুরে মনোভাব থেকে নিষ্কৃতি না পেলে মানুষের মন ভারতবর্ষ ও চীন দেশের সভ্যতার প্রতি অনুকূল হয় না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, য়ুরোপীয় সভ্যতা জন্মলাভ করেছে শহরে ও সেইখানেই লালিত পালিত। অপর পক্ষে ভারতবর্ষের সভ্যতা জন্মগ্রহণ করেছে বনে, অর্থাৎ ঋষির আশ্রমে, ও সেইখানেই লালিত পালিত হয়েছে।

পুরাণকাররা বলেছেন যে ভারতবর্ষ আসলে কর্মভূমি, আর এ দেশ সেই কর্মের ভূমি, যে কর্ম দেব-দানবরা করতে পারেন না। এ কর্ম হচ্ছে কৃষিকর্ম। আর এইটিই ভারতবর্ষের জিওগ্রাফির গোড়ার কথা আর অন্তরের কথা। আর এই ভিত্তির উপরেই ভারতবাসীর মন প্রাণ গড়ে উঠেছে।

যুধিষ্ঠিরের শিষ্টাচার

রাজশেখর বসু

[রাজশেখর বসু মহাশয় মূল সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনীগুলিকে সরল বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। এই কাহিনীটি তাঁহার রচিত মহাভারত হইতে সংকলিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুজনদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন।]

যুধিষ্ঠির দেখলেন, সাগরতুল্য দুই সেনা যুদ্ধের জন্য সমুদ্যত ও চঞ্চল হয়েছে। তিনি তাঁর বর্ম খুলে ফেলে অস্ত্র ত্যাগ ক'রে সত্বর রথ থেকে নামলেন এবং শত্রুসেনার ভিতর দিয়ে পদব্রজে কৃতাঞ্জলিপুটে ভীষ্মের অভিমুখে চললেন। তাঁকে এইরূপে যেতে দেখে তাঁর ভ্রাতারা, কৃষ্ণ, এবং প্রধান প্রধান রাজারা উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁর অনুসরণ করলেন। ভীমার্জুনাদি জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজ আপনার অভিপ্রায় কি? আমাদের ত্যাগ ক'রে নিরস্ত্র হয়ে একাকী শত্রুসেনার অভিমুখে কেন যাচ্ছেন? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন না, যেতে লাগলেন। কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, আমি এঁর অভিপ্রায় বুঝেছি, ইনি ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুজনকে সম্মান দেখিয়ে তার পর শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। শাস্ত্রে আছে, গুরুজনকে সম্মানিত ক'রে যুদ্ধ করলে নিশ্চয় জয়লাভ হয়, আমিও তাই মনে করি।

যুধিষ্ঠিরকে আসতে দেখে দুর্যোধনের সৈন্যরা বলাবলি করতে লাগল, এই কুলাঙ্গার ভয় পেয়ে ভ্রাতাদের সঙ্গে ভীষ্মের শরণ নিতে আসছে; ভীমার্জুনাদি থাকতে যুধিষ্ঠির যুদ্ধে ভীত হ'ল কেন? প্রখ্যাত ক্ষত্রিয় বংশে নিশ্চয় এর জন্ম হয় নি। সৈন্যরা এই ব'লে আনন্দিতমনে তাদের উত্তরীয় নাড়তে লাগল।

ভীষ্মের কাছে এসে দুই হাতে তাঁর পা ধ'রে যুধিষ্ঠির বললেন, দুর্ধর্ষ পিতামহ, আপনাকে আমন্ত্রণ করছি, আপনার সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করব, আপনি অনুমতি দিন, আশীর্বাদ করুন। ভীষ্ম বললেন, মহারাজ যদি এইভাবে

আমার কাছে না আসতে তবে তোমাকে আমি পরাজয়ের জন্য অভিশাপ দিতাম। পাণ্ডুপুত্র, আমি প্রীত হয়েছি, তুমি যুদ্ধ কর, জয়ী হও, তোমার আর যা অভীষ্ট তাও লাভ কর। মানুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কারও দাস নয়, এ সত্য। কৌরবগণ অর্থ দিয়ে আমাকে বেঁধে রেখেছে, তাই কাপুরুষের ন্যায় তোমাকে বলছি—আমি পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে পারি না; এ ভিন্ন আমার কাছে তুমি আর কি চাও বল। যুধিষ্ঠির বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ, আমার জিতের জন্য আপনি মন্ত্রণা দিন এবং কৌরবদের জন্য যুদ্ধ করুন, এই আমার প্রার্থনা। ভীষ্ম বললেন, আমি তোমার শত্রুদের পক্ষে যুদ্ধ করব, তুমি আমার কাছে কি সাহায্য চাও? যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি অপরাজেয়, যদি আমাদের শুভকামনা করেন তবে বলুন আপনাকে কোন্ উপায়ে জয় করব? ভীষ্ম বললেন, কৌন্তেয়, আমাকে যুদ্ধে জয় করতে পারে এমন পুরুষ দেখি না, এখন আমার মৃত্যুকালও উপস্থিত হয় নি; তুমি আবার আমার কাছে এসো।

ভীষ্মের কাছে বিদায় নিয়ে যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যের কাছে গেলেন এবং প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ক'রে বললেন, ভগবান, আপনাকে আমন্ত্রণ করছি, আমি নিষ্পাপ হয়ে যুদ্ধ করব, কোন্ উপায়ে সকল শত্রু জয় করতে পারব তা বলুন। ভীষ্মের ন্যায় দ্রোণাচার্যও বললেন, যুদ্ধের পূর্বে যদি আমার কাছে না আসতে তবে আমি অভিশাপ দিতাম। মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারও দাস নয়। কৌরবগণ অর্থ দিয়ে আমাকে বেঁধে রেখেছে, সেজন্য কাপুরুষের ন্যায় তোমাকে বলছি—আমি কৌরবদের জন্যই যুদ্ধ করব, কিন্তু তোমার বিজয়-কামনায় আশীর্বাদ করছি। যেখানে ধর্ম, সেখানেই কৃষ্ণ, যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়। তুমি যাও, যুদ্ধ কর। আর যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তো বল। যুধিষ্ঠির বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনি অপরাজেয়, যুদ্ধে কি ক'রে আপনাকে জয় করব? দ্রোণ বললেন, বৎস, আমি যখন রথারূঢ় হয়ে শরবর্ষণ করি তখন আমাকে বধ করতে পারে এমন লোক দেখি না। আমি যদি অস্ত্র ত্যাগ ক'রে অচেতনপ্রায় হয়ে মরণের প্রতীক্ষা করি তবেই আমাকে বধ করা যেতে পারে। যদি কোনও বিশ্বস্ত পুরুষ আমাকে অত্যন্ত অপ্রিয় সংবাদ দেয় তবে আমি যুদ্ধকালে অস্ত্র ত্যাগ করি—তোমাকে এই কথা সত্য বলছি।

তারপর যুধিষ্ঠির কৃপাচার্যের কাছে গেলেন। তিনিও ভীষ্ম-দ্রোণের ন্যায় নিজের পরাধীনতা জানিয়ে বললেন, মহারাজ, আমি অবধ্য, তথাপি তুমি যুদ্ধ কর, জয়ী হও। তোমার আগমনে আমি প্রীত হয়েছি; সত্য বলছি, আমি প্রত্যহ নিদ্রা থেকে উঠে তোমার জয় কামনা করব।

তারপর যুধিষ্ঠির শল্যের কাছে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করলেন। শল্যও বললেন, তোমার সম্মান প্রদর্শনে আমি প্রীত হয়েছি, তুমি না এলে আমি শাপ দিতাম। আমি কৌরবগণের বশীভূত, তোমার কি সাহায্য করব বল। যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি পূর্বে বর দিয়েছিলেন যে যুদ্ধকালে সূতপুত্রের তেজ নষ্ট করবেন, সেই বরই আমার কাম্য। শল্য বললেন, কুন্তীপুত্র, তোমার কামনা পূর্ণ হবে, তুমি যাও, যুদ্ধ কর, তুমি নিশ্চয় জয়ী হবে।

কৌরবগণের মহাসৈন্য থেকে নির্গত হয়ে যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে ফিরে গেলেন। তখন কৃষ্ণ কর্ণের কাছে গিয়ে বললেন, শুনেছি তুমি ভীষ্মের প্রতি বিদ্বেষের জন্য এখন যুদ্ধ করবে না; যতদিন ভীষ্ম না মরেন ততদিন তুমি আমাদের পক্ষে থাক। ভীষ্মের মৃত্যুর পর যদি দুর্যোধনকে সাহায্য করা উচিত মনে কর তবে পুনর্বার কৌরবপক্ষে যেয়ো। কর্ণ বললেন, কেশব, আমি দুর্যোধনের অপ্রিয় কার্য করব না; জেনে রাখ, আমি তাঁর হিতৈষী, তাঁর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েছি।

কৃষ্ণ পাণ্ডবের কাছে ফিরে গেলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির কুরুসৈন্যের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বললেন, যিনি আমাদের সাহায্য করতে চান তাঁকে আমি বরণ ক'রে নেব। এই কথা শুনে যুযুৎসু বললেন, যদি আমাকে নেন তবে আমি ধার্তরাষ্ট্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। যুধিষ্ঠির বললেন, যুযুৎসু, এস এস, আমরা সকলে মিলে তোমার নির্বোধ ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, বাসুদেব ও আমরা একযোগে তোমাকে বরণ করছি। দেখছি তুমিই ধৃতরাষ্ট্রের পিণ্ড ও বংশ রক্ষা করবে।

ভ্রাতাদের ত্যাগ ক'রে যুযুৎসু দুন্দুভি বাজিয়ে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পুনর্বার বর্ম ধারণ ক'রে রথে উঠলেন, রণবাদ্য বেজে উঠল, বীরগণ সিংহনাদ করলেন। পাণ্ডবগণ মান্যজনকে সম্মানিত করেছেন দেখে আর্য ও ম্লেচ্ছ সকলেই গদ্‌গদ কণ্ঠে প্রশংসা করতে লাগলেন।

মেরী কুরী

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

মেরী স্কল্‌ডোয়াস্কা কুরী ১৮৬৭ সালে পোল্যান্ডের ওআরস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ওই শহরের এক স্কুলে বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষক ছিলেন। স্কুলের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ ছিল যে, শিক্ষককেই অনেক সময় নিজের পয়সায় বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি কিনে নিতে হত। মেরী দিনের বেলায় স্কুলে যেতেন আর সন্ধ্যার সময় পরীক্ষাগারে এসে তাঁর বাবাকে সাহায্য করতেন,—টেস্টটিউব ধুতেন, যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করতেন। স্কুল ত্যাগ করার পর তিনি কয়েক বছর নিকটবর্তী এক ধনীর সন্তানদের গৃহশিক্ষয়িত্রীর কাজে নিযুক্ত হয়ে অল্প কিছু করে উপার্জন করতে থাকলেন, শেষে ১৮৯১ সালে প্যারিস অভিমুখে রওনা হলেন, নিজের কর্মশক্তি ও ধীশক্তি ছাড়া কোনো সম্বল সঙ্গে রইল না। প্যারিসে সব চেয়ে দরিদ্রেরা যে অংশে বাস করত, তিনি সেখানে একটা অতি ছোট ঘরে আশ্রয় নিলেন, আহার একেবারে সাধারণ ও অপ্রচুর; ফলে শরীর জীর্ণ হতে থাকল। প্রথমে একটি রসায়নাগারে উনান ধরানো, টেস্টটিউব পরিষ্কার করার কাজ নিলেন, কিন্তু কর্মপটুতায় অল্পকালের মধ্যে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, আর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার সুবিধে পেলেন। এই সময় পিরী কুরী পদার্থবিদ্যায় কয়েকটি বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, স্বল্প বেতনে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত। মেরী বিজ্ঞানের অনেক বিষয় তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন। ১৮৯৫ সালে তাঁরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। তখন তাঁরা এতই গরিব যে বাড়ির কাজকর্ম করবার জন্যে একজনও চাকর ছিল না, অধ্যাপক কুরী ঘর ঝাঁট দিতেন, ম্যাডাম কুরী রান্না করতেন।

যে-বছর তাঁদের বিয়ে হল সেই বছর রন্‌ট্‌গেন এক্‌স-রশ্মি আবিষ্কার করেন, আর পরের বছর বেকারেল ইউরেনিয়ম থেকে এক্‌স-রশ্মির অনুরূপ

তেজ লক্ষ্য করলেন। কুরী দম্পতি বেকারেলের এই গবেষণায় আকৃষ্ট হলেন, ইউরেনিয়ম ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ থেকে অনুরূপ তেজ বেরয় কি না সে সম্বন্ধে ম্যাডাম কুরী অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন। কিন্তু পরীক্ষাগার বলে তিনি কিছুই পান নি, একটি ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে গুদামঘরের একটা অংশ জোড়াতাড়া দিয়ে কয়েকটি যন্ত্র খাড়া করে তিনি তাঁর গবেষণা শুরু করলেন।

ইউরেনিয়ম পাওয়া যাচ্ছিল পিচব্লেন্ড নামে এক খনিজ পদার্থ থেকে। ম্যাডাম কুরী লক্ষ্য করলেন যে, পিচব্লেন্ড থেকে ইউরেনিয়ম বের করে নেবার পর যা বাকি থাকে, আর এতদিন যাকে অকেজো বলে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল, সেই পরিত্যক্ত অংশের তেজ ইউরেনিয়মের তেজের অনেকগুণ বেশি। এই সময় অধ্যাপক কুরী এই কাজে যোগ দিলেন। দুই মনীষার সংযোগ হল। তখন অধ্যাপকের উপার্জন অল্প, ইরীন বলে তাঁদের একটি কন্যা হয়েছে, বাধ্য হয়ে ম্যাডাম কুরীকে নিকটবর্তী একটি বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিতে হল। প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাগার বলে তাঁদের কোনো ঘর ছেড়ে দিতে পারল না, শেষে তাঁরা এক চালাঘরকে তাঁদের পরীক্ষাগাররূপে বানিয়ে নিলেন। ঘরের ছাউনি দিয়ে জল পড়ে, মেঝে পাকা নয়, আর দুটো নড়নড়ে টেবিল ছাড়া ঘরে আসবাবপত্র কিছুই নেই। শীতের দিনে সেখানে প্রায় জমে যেতেন, গ্রীষ্মকালে প্রায় দমবন্ধ হয়ে আসত। এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত তাঁরা গবেষণায় নিযুক্ত রইলেন। কিন্তু ম্যাডাম কুরী পরে একদিন বলেছিলেন যে জীবনের এই সময়টি তাঁদের সবচেয়ে আনন্দের মধ্যে দিয়ে কেটেছে।

কুরী দম্পতি ভাবলেন যে পিচব্লেন্ডে এমন কোনো অনাবিষ্কৃত পদার্থ আছে যা ইউরেনিয়মের অনেকগুণ বেশি তেজস্কর। এই নতুন পদার্থের আবিষ্কারে তাঁরা নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন। কিন্তু এর জন্যে বহু পরিমাণে পিচব্লেন্ড চাই, তা কেনবার পয়সা তাঁদের নেই। অস্ট্রিয়ার গভর্নমেন্ট দয়াপরবশ হয়ে বোহিমিয়ার এক খনি থেকে তোলা এক টন পিচব্লেন্ড কুরী দম্পতিকে পাঠিয়ে দিলেন। এখন তাঁরা এক কঠোর সাধনায় ব্যাপৃত রইলেন। প্রথমে তাঁরা এক নতুন পদার্থ পেলেন যা ইউরেনিয়মের

চেয়ে কিছু বেশি তেজস্কর। ম্যাডাম কুরীর জন্মভূমি ছিল পোল্যান্ড। তিনি তাঁর দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ওই পদার্থের নাম দিলেন পলোনিয়ম।

কিন্তু পলোনিয়ম বের করে নেবার পরও দেখা গেল যে আগের তেজ প্রায় সমানই রইল। তা হলে পলোনিয়ম ছাড়া অন্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিশ্চয় ওর মধ্যে আছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, কয়েক বছর ধরে সমান-ভাবে পরীক্ষাগারে কাজ চলতে লাগল, অদম্য উৎসাহে কুরী দম্পতি তাঁদের সাধনায় মগ্ন রইলেন। শেষে ১৯০২ সালে তাঁরা রেডিয়ম বলে এক নতুন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করলেন, বিশুদ্ধ অবস্থায় নয়, রেডিয়ম ক্লোরাইড রূপে। দেখা গেল, এই বস্তু সমপরিমাণ ইউরেনিয়মের প্রায় লক্ষগুণ বেশি তেজস্কর।

১৯০৩ সালে ম্যাডাম কুরী এক বক্তৃতায় তাঁদের আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করলেন। পৃথিবীময় একটা সাড়া পড়ে গেল। কয়েক মাস পরে তাঁদের আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে তাঁরা লন্ডনে নিমন্ত্রিত হলেন, গ্রেট ব্রিটেনের সমস্ত বিজ্ঞানী এই রেডিয়ম দেখতে আর তার গুণাবলী জানতে সমবেত হলেন। অধ্যাপক কুরী পরীক্ষায় দেখালেন যে, রেডিয়ম থেকে সব সময় আপনা-আপনি তাপ বেরুচ্ছে, দেখালেন যে কাছে যদি জিঙ্ক সালফাইডের গুঁড়া ধরা যায়, তবে তা সব সময়ই ঝিক্‌মিক্ করতে থাকে। এই বছরের শেষে কুরী দম্পতিকে আর বেকারেলকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল। এই প্রথম একজন মহিলা নোবেল পুরস্কার পেলেন। ফরাসি দেশ দুটি নতুন পদের সৃষ্টি করে কুরী দম্পতিকে বসালেন। জীবনে এই প্রথম তাঁরা সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে লাগলেন। কিন্তু এ সুখশান্তি বেশিদিন টিকল না। কুরী দম্পতি যখন তাঁদের খ্যাতির শীর্ষস্থানে তখন একদিন রাস্তায় চলবার সময় অধ্যাপক কুরী গাড়ি চাপা পড়লেন, মুহূর্তমধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটল। শুধু কুরীর আবাসে নয়, সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে শোকের একটা ঘনছায়া পড়ল।

বিশ্ববিদ্যালয় পিরী কুরীর স্থলে ম্যাডাম কুরীকে অধ্যাপিকা নিযুক্ত করল। সে এক নিদারুণ শোকের দৃশ্য যেদিন ম্যাডাম কুরী তাঁর প্রথম বক্তৃতা দিতে উপস্থিত হলেন। হলে যত লোক ধরে তার দশগুণ লোক এসেছে, অধিকাংশ

লোক বাইরে দাঁড়িয়ে। ঘড়িতে দেড়টা বাজল, ধীর পদবিক্ষেপে পিছনের দরজা দিয়ে অধ্যাপিকা হলে ঢুকলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী বিপুল জয়ধ্বনি করে তাঁকে অভিবাদন জানাল। তারপর সভা স্তব্ধ, সকলে উদ্‌গ্রীব, কী ভাবে তিনি তাঁর বক্তৃতার সূচনা করবেন। তাঁকে এই পদ দেবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ দিয়ে কী আরম্ভ করবেন! নতুন অধ্যাপকের পক্ষে রীতি হল যে, তিনি যাঁর জায়গায় এসেছেন তাঁর গুণগান করে আরম্ভ করা। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি যে স্বামী। অধ্যাপিকা আরম্ভ করলেন তাঁর স্বামী শেষ বক্তৃতায় যে বাক্য উচ্চারণ করে চিরদিনের মতো থেমে গিয়েছিলেন, ঠিক তার পর থেকে।

ম্যাডাম কুরী এখন একলা তাঁর গবেষণায় নিমগ্না রইলেন, শেষে ১৯১১ সালে তিনি বিশুদ্ধ পলোনিয়ম ও রেডিয়ম বার করলেন। এই কাজের জন্য আবার তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল, এবার রসায়ন বিভাগ থেকে। এর আগে বা এর পরে কোনো পুরুষ বা কোনো নারী দুবার নোবেল পুরস্কার পান নি। সুইডেনে এই পুরস্কার নিতে যখন তিনি গেলেন তখন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছে, সঙ্গে তাঁর কন্যা ইরীন। যে-সভায় ওই পুরস্কার দেওয়া হল বালিকা সেই সভায় উপস্থিত ছিল। চব্বিশ বছর পরে সেই ইরীন ওইখানে আবার উপস্থিত হয়ে এবার নিজে পুরস্কার নিলেন, সেই সঙ্গে তাঁর স্বামীও পুরস্কার পেলেন। মা ও মেয়ে, শ্বশুর ও জামাই চার জনের পুরস্কার পাওয়া নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ব্যাপার।

পিরী কুরীর মৃত্যুর আট বছর পরে, ম্যাডাম কুরী যখন বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে যাবেন কেবল তখনই একটি রেডিয়ম ইন্‌স্টিটিউট স্থাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁর হাতে প্রচুর অর্থ দিলেন। এর আগে পর্যন্ত তাঁদের গবেষণার জন্য একখানি ঘর ছেড়ে দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

রেডিয়ম ইন্‌স্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হল, বহু বিজ্ঞানী সমবেত হয়ে তাঁর নির্দেশে কাজ আরম্ভ করলেন। কিন্তু এর অব্যবহিত পরে সমগ্র ইউরোপে সমরানল জ্বলে উঠল, সহকারীরা সব চলে গেলেন, ম্যাডাম কুরী একলা পড়লেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর রেডিয়ম সম্বন্ধে বিবিধ গবেষণা আবার আরম্ভ হল, নব নব আবিষ্কারের কথা ঘোষিত হতে থাকল।

নানা প্রতিষ্ঠান হতে তাঁর উপর সম্মান বর্ষিত হয়েছিল, কিন্তু তাতে তিনি অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করতেন। লোকচক্ষুর অগোচরে নিঃশব্দে কাজ করে যাওয়া, এই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। দুটি কন্যাকে নিয়ে তিনি সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন।

১৯৩৪ সালে তাঁর মৃত্যু হল। আইনস্টাইন বলেছিলেন, ম্যাডাম কুরী ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁকে খ্যাতি নষ্ট করে নি।

(সংক্ষেপিত)

ভারতলক্ষ্মী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী!
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী!
জনকজননী-জননী!
নীলসিন্ধুজলধৌত চরণতল,
অনিলবিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিত ভাল হিমাচল,
শুভ্রতুষারকিরীটিনী!
প্রথম প্রভাত-উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে,
জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী!
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবীযমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী!

ব্যাঘ্র সহ কালকেতুর যুদ্ধ

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

বাঘ দেখি আকর্ণ পূর্ণিত কৈল বাণ।
আকর্ণ পুরিয়া বীর করিল সন্ধান॥
বীরকে দেখিয়া বাঘা নাহি করে ভয়।
পথ আগুলিয়া আসি মুখ মেলি রয়॥
লঘুগতি ধায় বাঘা আঁচড়িয়া ক্ষিতি।
জোড় হাতে বীর নিবেদয়ে দিনপতি॥
তুমি না উদয় হৈলে সকলি আন্ধার।
ভালোমন্দ সবাকার করহ বিচার॥
ধন দিয়া সত্য কৈল নগেন্দ্রনন্দিনী।
আজি হৈতে কালকেতু না বধিহ প্রাণী॥
মোর কিছু দোষ নাই হইবে প্রমাণ।
দুই জানু পাতি বীর ছাড়ি দিল বাণ॥
সাঞি সাঞি করি বাণ যায় ব্যোমপথে।
বাণগোটা লোফি বাঘা চিবাইল দাঁতে॥
জুড়িতে উদ্যোগ বীর করে আর বাণ।
লাফ দিয়া বাঘা তার ধরে ধনুখান॥
বজ্র মুটকি বীর মারে তার মুণ্ডে।
ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়ে তার তুণ্ডে॥
মুটকি খাইয়া বাঘা পুনরপি ধায়।
বজ্র চাপড় মারে মহাবীরের গায়॥
মহাবীর অঙ্গে তার নখ নাহি ফুটে।
চাপড় খাইয়া বীর বলে নাহি টুটে॥
পাছু হৈয়া মহাবীর জুড়িল কৃপাণ।
সেই ঘায়ে বাঘারে করিলা দুইখান॥

দক্ষযজ্ঞ নাশ

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

[পিতৃমুখে শিবনিন্দা-শ্রবণে দক্ষদুহিতা সতী দেহত্যাগ করিলে ক্রুদ্ধ শিব তাঁহার অনুচর-বর্গ-সহ কিরূপ তান্ডবে দক্ষযজ্ঞ নাশ করিয়াছিলেন—কবি এইস্থলে তাহারই বর্ণনা দিয়াছেন।]

ভূতনাথ ভূতসাথ
দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ
অট্ট অট্ট হাসিছে॥
প্রেতভাগ সানুরাগ
ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল
চৌদ্দলোক কাঁপিছে॥
সৈন্যসূত মন্ত্রপূত
দক্ষ দেয় আহুতি।
জন্মি তায় সৈন্য ধায়
অশ্বঢালী মাহুতি॥
রুদ্রদূত ধায় ভূত
নন্দীভৃঙ্গী সঙ্গিয়া।
ঘোর বেশে মুক্ত কেশে
যুদ্ধরঙ্গ রঙ্গিয়া॥
ভার্গবের সৌষ্ঠবের
দাড়িগোঁফ ছিঁড়িল।
পূষণের ভূষণের
দন্তপাঁতি পাড়িল॥

বিপ্র সর্ব দেখি খর্ব
ভোজ্য বস্ত্র সারিছে।
ভূতভাগ পায় লাগ
লাথি কিল মারিছে॥
ছাড়ি মন্ত্র ফেলে তন্ত্র
মুক্তকেশ ধায় রে।
হায় হায় প্রাণ যায়
পাপ দক্ষ দায় রে॥
মার মার ঘোর ঘোর
হান হান হাঁকিছে।
হুপ হাপ দুপ দাপ
আশপাশ ঝাঁকিছে॥
ঊর্ধ্ববাহু যেন রাহু
চন্দ্র-সূর্য পাড়িছে।
লম্ফঝম্প ভূমিকম্প
নাগ কূর্ম লাড়িছে॥
অগ্নি জ্বালি সর্পি ঢালি
দক্ষ-দেহ পুড়িছে।
ভস্মশেষ হৈল দেশ
রেণু রেণু উড়িছে॥

অরণ্যে



বিহারীলাল চক্রবর্তী

নিস্তব্ধ গম্ভীর ঘোর
নিবিড় গহন,
ঘনপত্র-ঝোপে রুদ্ধ
রবির কিরণ;
বাহু-শাখা প্রসারিয়ে
পরস্পরে আলিঙ্গিয়ে
চক্রাকারে ঘেরে আছে
বৃক্ষ অগণন;
দীর্ঘ দীর্ঘ, স্থূলকায়,
বল্লরী বর্মিত তায়,
কোটরে কোটরে কত
কুলায় শোভন,
কাহারো নেবেছে জটা
এঁকা বেঁকা, কটা কটা,
তেড়া চাড়া ঠেক্‌নার
খুঁটির মতন;
কাহারো শিকড় দল,
উঠিয়ে ব্যাপিছে তল,
কুঞ্জরের কঙ্কালের
পঞ্জর যেমন,

গাঢ় ঘন ছায়াময়,
জনমে বিস্ময় ভয়,
নিরন্তর ঝর ঝর
পত্রের পতন;
কভু মৃগ মৃগী ধায়—
চকিত হইয়ে চায়,
কভু দূরে শুনা যায়
ভীষণ গর্জন!

দুরন্ত ঝটিকা

অক্ষয়কুমার বড়াল

আসে সন্ধ্যা মুখে লয়ে দুরন্ত ঝটিকা
রাশি রাশি শুষ্ক পত্র ঘুরে উড়ে যায়।
ডুবিয়া গিয়াছে রবি, দুটি রশ্মি-শিখা
আছাড়িছে পূর্বাকাশে মৃত্যু-যন্ত্রণায়!
তর্ তর্—থর্ থর্ উঠে মেঘরাশি;
ভিন্ন ভিন্ন পিকদল নীড়মুখে ধায়;
মড়্মড়ে অরণ্যানী কাতরে নিশ্বাসি';
ঊর্ধ্বপুচ্ছে গাভীকুল ছুটে গায় গায়।

ঝোপে-ঝোপে তরুতলে আঁধার ঘনায়;
ঝিকিমিকি করে আলো নারিকেল-শিরে;
হাঁকিছে—ডাকিছে সবে আপন জনায়,
ফুঁসিয়া-ফুঁসিয়া নদী আছাড়িছে তীরে।
ঝাপটে-দাপটে বায়ু ছাড়িছে হুংকার,
ভাঙে শাখা, পাড়ে চাল, তরু উপড়ায়;
দেখিতে-দেখিতে ধরা মেঘে অন্ধকার,
তড়্ তড়্ করে বৃষ্টি মুষলধারায়।

উড়িতেছে চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি,
মেঘ হতে মেঘান্তরে ঝলসে বিজলী;
কড়্ কড়্ মুহুর্মুহু গরজে অশনি;
তরুশির, গৃহচূড়া উঠে ধূ ধূ জ্বলি'।

মনে হয়,—পাই যদি ওই বজ্রবল,
ধরারে গুঁড়ায়ে ফেলি ধূলার সমান!
ঘুচে যায় দুঃখ শোক ভাবনা সকল,
নাহি রহে বিশ্বে আর জন্মমৃত্যু-স্থান!

প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত



কহিলা বাসন্তী সখী;—"কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ঘ্য সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে!
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা।"
রুষিলা দানববালা প্রমীলা রূপসী!—
"কী কহিলি, বাসন্তি? পর্বত-গৃহ-ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানবনন্দিনী আমি, রক্ষঃ-কুল-বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে,
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি।"
এতেক কহিয়া সতী, গজ-পতি-গতি,
রোষাবেশে প্রবেশিলা সুবর্ণ-মন্দিরে।
যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা
নারী-দেশে, দেবদত্ত শঙ্খনাদে রুষি,
রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে;—

উথলিল চারি দিকে দুন্দুভির ধ্বনি;
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,
উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্মুক টংকারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে! ঝক্ ঝক্ ঝকি
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী!
মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব, ঊর্ধ্ব-কর্ণে শুনি
নূপুরের ঝনঝনি, কিঙ্কিণীর বোলী,
ডমরুর রবে যথা নাচে কালফণী।
সাজিলা দানববালা, হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিংবা শুম্ভ নিশুম্ভ, উন্মদ বীরমদে।
ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ। চড়িলা সুন্দরী
বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নি-শিখা!
যথা বায়ু-সখা সহ দাবানলগতি
দুর্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জিল জলধি;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে;—
কিন্তু নিশাকালে কবে ধূমপুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নিশিখা? অগ্নিশিখা-তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে।

('মেঘনাদবধ' কাব্যের তৃতীয় সর্গ হইতে সংক্ষেপিত)

কুরুক্ষেত্র

নবীন চন্দ্র সেন

[সংশপ্তক-যুদ্ধ-বিজয়ী অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিবার সময়ে চক্রব্যূহযুদ্ধে সপ্তরথী কর্তৃক নিহত বালকবীর অভিমন্যুর শোকে অভিভূত হইয়া কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গন দর্শন করিলেন।]

দেখিলেন কুরুক্ষেত্র শোকের সাগর।
শবচক্র মহাবেলা ; প্রশস্ত প্রাঙ্গণ
ব্যাপিয়া পাণ্ডবসৈন্য, ঊর্মির মতন
উদ্বেলিত মহাশোকে, কাঁদে অধোমুখে,—
গুণহীন ধনু, পৃষ্ঠে শরহীন তূণ।
রথি-মহারথিগণ বসিয়া ভূতলে
কাঁদিতেছে অধোমুখে, যেন আভাহীন
সিক্ত রত্নরাজি পড়ি' রত্নাকর-তলে।
বাণবিদ্ধ-মীন-সম পাণ্ডব সকল
যাইতেছে গড়াগড়ি পড়িয়া ভূতলে।
মূর্ছিত বিরাটপতি ; স্তম্ভিত প্রাঙ্গণ ;
কেন্দ্রস্থলে অভিমন্যু শরের শয্যায়,—
সিদ্ধকাম মহাশিশু! ক্ষত কলেবর
রক্ত-জবা-সমাবৃত ; সস্মিত বদন
মায়ের পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত
—সন্ধ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র উজ্জ্বল,—
নিদ্রা যাইতেছে সুখে। বক্ষে সুলোচনা
মূর্ছিতা ; মূর্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা,
সহকার-সহ ছিন্ন ব্রততীর মত।
কেবল দুইটি নেত্র শুষ্ক, বিস্ফারিত,
এই মহাশোক-ক্ষেত্রে ; কেবল অচল

সেই মহাশোক-ক্ষেত্রে একটি হৃদয়;
সেই নেত্র, সেই বুক মাতা সুভদ্রার।
চাপি' মৃতপুত্র-মুখ মায়ের হৃদয়ে
দুই করে, বিস্ফারিত নেত্রে প্রীতিময়,
যোগস্থা জননী চাহি আকাশের পানে।—
আদর্শ বীরত্ব বক্ষে, প্রীতির প্রতিমা!—
নীরব বিস্তৃত ক্ষেত্র। থাকিয়া থাকিয়া
কেবল কাঁপিয়া ধীরে মায়ের অধর
গাহিতেছে কৃষ্ণনাম। মূর্ছিত অর্জুন
পড়িতে, ধরিলা কৃষ্ণ বাহু প্রসারিয়া।
উচ্ছ্বাসে কহিলা কৃষ্ণ,—"অর্জুন! অর্জুন!
আমরা বীরের জাতি, বীরধর্ম রণ!
অযোগ্য এ শোক তব। এই বীর-ক্ষেত্র
করিও না কলঙ্কিত করিয়া বর্ষণ
একবিন্দু শোক-অশ্রু। বীরর্ষভ তুমি,
বীরশোক অশ্রু নহে, অসির ঝংকার।"

পরশমণি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন?
অই যে অবনীতলে　　　　পরশমানিক জ্বলে,
বিধাতা-নির্মিত চারু মানব-নয়ন।
পরশমণির সনে　　　　লৌহ-অঙ্গ-পরশনে,
সে লৌহ কাঞ্চন হয় প্রবাদ-বচন,—
এ মণি পরশে যায়,　　　　মানিক ঝলসে তায়,
বরিষে কিরণধারা নিখিল ভুবন।
কবির কল্পিত নিধি　　　　মানবে দিয়াছে বিধি,
ইহার পরশগুণে মানব-বদন
দেবতুল্য রূপ ধরি'　　　　আছে ধরা আলো করি',
মাটির অঙ্গেতে মাখা সোনার কিরণ।

পরশমানিক যদি অলীক হইত,
কোথা বা এ শশধর,　　　　কোথা বা ভানুর কর,
কোথা বা নক্ষত্র-শোভা গগনে ফুটিত?
কে রাখিত চিত্র ক'রে　　　　চাঁদের জোছনা ধ'রে
তরঙ্গে মেঘের অঙ্গে এমন মাখায়ে?
কে বা এই সুশীতল　　　　বিমল গঙ্গার জল
ভারত-ভূষণ করি রাখিত ছড়ায়ে?
কে দেখাত তরুকুল,　　　　নানা রঙ্গে নানা ফুল,
মরাল, হরিণ, মৃগে পৃথিবী শোভিয়া?
ইন্দ্রধনু-আলো তুলে　　　　সাজায়ে বিহংগকুলে,
কে রাখিত শিখিপুচ্ছে শশাঙ্ক আঁকিয়া?

দিয়াছে বিধাতা যাই এ পরশমণি—
স্বর্গের উপমাস্থল হয়েছে এ মহীতল,
সুখের আকর তাই হয়েছে ধরণী!
কী আছে ধরণী-অঙ্গে, নয়ন-মণির সঙ্গে
না হয় মানবচিত্তে আনন্দদায়িনী!
নদীজলে মীন খেলে, বিটপীতে পাতা হেলে,
চরে বালুকণা ফুটে, তৃণেতে হিমানী,
পক্ষী পাখে উড়ে যায়, কীটেরা শ্রেণীতে ধায়,
কঙ্করে তুষার পড়ে, ঝিনুকে চিক্কণী।
তাতেও আনন্দ হয়— অরণ্য কুজ্ঝটিময়,
জ্বলন্ত বিদ্যুৎলতা, তমিস্রা রজনী।

অপূর্ব মানিক এই পরশ-কাঞ্চন!
জননী-বদন-ইন্দু জগতে করুণা-সিন্ধু
দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন,
শত শশি-রশ্মিমাখা চারু ইন্দীবর-আঁকা
পুত্রের অধর-ওষ্ঠ, নলিন-আনন;
সোদরের সুকোমল, সখা-মুখ নিরমল,
পবিত্র প্রণয়পাত্র, গৃহীর রঞ্জন—
এ মণি পরশনে হয় সুখ দরশনে
মানব-জনম সার, সফল জীবন।—
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন?

বিদ্যাসাগর

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহাপর্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কী সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপা বিমলা কিংকরী;
যোগায় অমৃতফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি;
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে;
দিবসে শীতলশ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!

বঙ্গভাষা

অতুল প্রসাদ সেন

মোদের গরব, মোদের আশা—আ-মরি বাঙলা ভাষা!
তোমার কোলে তোমার বোলে কতই শান্তি ভালোবাসা॥
কী জাদু বাঙলা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা॥
ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা আনলে দেশে ভক্তিধারা;
আছে কই এমন ভাষা, এমন দুঃখ-ক্লান্তি-নাশা॥
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন
ঐ ভাষারই মধুর রসে বাঁধল সুখে মধুর বাসা॥
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আনলে মালা জগৎ জিনে;
তোমার চরণ-তীর্থে মাগো জগৎ করে যাওয়া-আসা॥
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাকলাম মায়ে 'মা মা' বলে;
ঐ ভাষাতেই বলব হরি সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা॥

জন্মভূমি

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা;
তাহার মাঝে আছে দেশ এক,—সকল দেশের সেরা,
ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি!

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমনধারা!
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ, এমন কালো মেঘে!
তারা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠে, পাখীর ডাকে জেগে;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি!

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়!
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মিশে!
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে!
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,—
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ!
—মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি—
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।



কয়াধু

— সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত —

[দিতি ও কশ্যপের পুত্র অসুরসম্রাট্ হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধু। ইনি জম্ভাসুরের কন্যা ও মহিষাসুরের ভগিনী। ইঁহার চারি পুত্র—প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, হ্লাদ ও অনুহ্লাদ।]

কার তরে এই শয্যা দাসী, রচিস্ আনন্দে?
হাতির দাঁতের পালঙ্কে মোর দে রে আগুন দে।
পুত্র যাহার বন্দীশালায় শিলায় শুয়ে হায়,
ঘুম যাবে সে দুধের-ফেনা ফুলের বিছানায়?
দুলাল যাহার শিকল-বেড়ির নিগ্রহে জর্জর,
জম্ভলিকা! রত্নমুকুট তার শিরে দুর্ভর!
রাণীত্বে আর নাই রে রুচি—নাই কিছুরি সাধ,
যে দিকে চাই কেবল দেখি লাঞ্ছিত প্রহ্লাদ!
যে দিকে চাই মলিন অধর, উপবাসীর চোখ,
যে দিকে চাই গগন-ছোঁয়া নীরব অভিযোগ,
যে দিকে চাই ব্রতীর মূর্তি নিগ্রহে অটল,
সাপের সাথে শিশুর খেলা, মন করে বিহ্বল।
গুমে গুমে পুড়ে যেন যাচ্ছে শরীর মন,
ক্লান্ত আঁখি মুদলে দেখি কেবল কু-স্বপন,
পাহাড় থেকে আছড়ে ফেলে দিচ্ছে পাথরে—
প্রহ্লাদে মোর; দিচ্ছে ঠেলে সাপের চাতরে।
জগদ্দলন পাষাণ বুকে ফেলছে তরঙ্গে
চোরের সাজে সাজিয়ে সাজা চোরেরি সঙ্গে!

কভু দেখি ফেলছে বাছায় পাগলা হাতির পায়,—
বিদ্রোহীদের প্রাপ্য সে আজ নিরীহ জন পায়!
কী দোষ বাছার বুঝতে নারি অবাক চোখে চাই,
ইচ্ছা করে এ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যাই।
ফিরে এল শিক্ষা-শেষে শিশু পুলক-মন,
ভীষণ সাপের আবর্তে হায় এই সমাবর্তন!
প্রশ্ন হ'ল—"কী শিখেছ?" রাজার সভা-মাঝে
কয় শিশু—"তাঁর নাম শিখেছি রাজার রাজা যে;
তিন ভুবনের প্রভু যিনি, প্রভু যে চার যুগে
শিখেছি নাম জপতে তাঁহার, গাইতে সে নাম মুখে।"
ছেলের বোলে ক্রোধোন্মত্ত দৈত্য ধুরন্ধর,
"আমার আগে অন্যে বলে ত্রিভুবনেশ্বর!
খর্ব করে রাজায় যে তার রাখব না মাথা,
দণ্ডবিধান করব, স্বয়ং আমিই বিধাতা।"
বাক্য শুনে বালক বলে বিনয় বচনে—
"হৃদয় আমার নিরত যাঁর অর্ঘ্য-রচনে,
পিতার পিতা মাতার মাতা রাজার রাজা সেই,
সত্য তিনি নিত্য তিনি তাঁর তুলনা নেই।"
কথার শেষে কোটাল এসে বাঁধল ক'সে তায়,
শান্ত শিশু হাসল শুধু শিষ্ট উপেক্ষায়।
চিত্ত-বলের লড়াই শুরু পশু-বলের সাথ,
বন্যা-বেগের হানার মুখে কিশোর-তনুর বাঁধ!
প্রলয়-জলে বটের পাতা! চিত্ত-চমৎকার!
তীর্থ হ'ল বন্দীশালা, শিকল অলংকার।
খেদ কিছু নাই, আর না ডরাই, চিত্তে মাভৈঃ রব,
উচিত ব'লে বন্দী ছেলে এ মম গৌরব!
কয়াধু তোর জনম সাধু, মোছ রে চোখের জল,
রাজ-রোষেরি রোশনায়ে তোর মুখ হ'ল উজ্জ্বল!

বর্ষা-সুন্দরী

মানকুমারী বসু

রাত দিন ঝম্-ঝম্
রাত দিন টুপ্-টুপ্,
কী সাজে সেজেছ, রাণি!
এ কী আজ অপরূপ!
আননে বিজলী-হাসি,
গলায় কদম-হার,
আঁচলে কেতকী-ছটা—
এ আবার কী বাহার!
শিখী নাচে, ভেকে গায়,
মেঘে গুরু গরজন,
বসুধা আনন্দভরে
কত করে আয়োজন!
ডুবেছে রবির ছবি,
ডুবেছে চাঁদিয়া তারা,
আকাশ গলিয়া পড়ে
তরল রজত-ধারা।
জলদ বিজলী তা'রা
এ উহার কর ধ'রে
চলেছে পিছল পথে,
পা যেন পড়ে না স'রে।
ভিজে গেল—ভেসে গেল—
ডুবে গেল ধরাখান,
গ'লে গেল, মেতে গেল
মানবের ক্ষুদ্র প্রাণ।

প্রকৃতি ঢেকেছে মুখ
শ্যামল সুন্দর বাসে,
চাহিলে তাহার পানে
কত কী যে মনে আসে!
সসীমে অসীমে আজ
হ'য়ে গেল মিশামিশি,
বুঝিনে আপন পর
চিনিনে সে দিবানিশি!

(সংক্ষেপিত)

ছেলে ও মেয়ে

যতীন্দ্রমোহন বাগচি

পুষ্পে-ভরা কৃষ্ণচূড়ার তলে
ছোটোদের আজ ছুটির খেলা চলে,
পড়ার বালাই নাই;
পটোল পাঁচু যদু মধু নীলে
ছোটোয়-বড়োয় পাঁচটি ছেলে মিলে'
জুটেছে আজ তাই।

পারুল দীপা শৈলী হাসি সরো
পাঁচটি মেয়েও হয়েছে আজ জড়ো
এক পাড়াতেই বাড়ি:—
ঠিক করেছে মেয়েরা আজ সবে
ছেলের দলকে হারিয়ে দিতে হবে,
নাইক ছাড়াছাড়ি!

চোখগুলো সব আনন্দে উজ্জ্বল
মাটির বাড়ি গড়ছে ছেলের দল,
পাঁচজনে একধারে,
মেয়ের দলও সবাই করছে আজ
মাটির একটা কেল্লা-গড়ার কাজ,
কে জিতে, কে হারে!

হাতের কাছে গাছের কাঁচডাল,
সবুজ পাতায় থোকায়-থোকায় লাল
কৃষ্ণচূড়ার ফুলে.
"কে চায় পাতা, কে নেবে রে ফুল,"
শুধায় দীপা দুলিয়ে কানের দুল,
চোখদুটো তার তুলে'।

"আমরা পাতা," কইল হেসে যদু,
"আমরা কাঁচা," টিপ্পনী দেয় মধু,
"সবুজ মোদের সাজ।"
মেয়ের দলের লালের উপর লোভ,
তাদেরও আজ রইল নাক ক্ষোভ,
সবাই খুশী আজ।
মেয়ের দলের কাজটা হ'লে সারা
ফুলের নিশান উঁড়িয়ে দিল তারা,
মাটির গড়ের শিরে,
ছেলের দলও সবুজ পাতা হাতে,
সবুজ কেতন উঁড়িয়ে দিল ছাতে
বাড়ির মাথা ঘিরে।
জিতল কারা, কাদের হ'ল হার
বিচার তাহার করবে কে এইবার,
ভাবছে সবাই তাই,
এমন সময় দেখল সেখান হ'তে
বুড়ো গোছের পথিক একটি পথে
আসছে এদিকটাই।
এগিয়ে সবাই আনল ডেকে তারে,
ছেলে মেয়ে,—যেমনটি যে পারে,
করল অনুনয় ;—
দু'টি দলের কাজের পরীক্ষায়
মন্দ-ভালো জানতে শুধু চায়,
যা' তার মনে হয়।
পরীক্ষকের পদটি হঠাৎ পেয়ে
বললে পথিক দু'দিক পানে চেয়ে
"খাসা, চমৎকার ;—

মনের মিলে, রঙের মিলে আজ,
দুই দলেরই সমান ভালো কাজ,—
সমান পুরস্কার।

সবাই শুধায় তাকিয়ে তাহার পানে,
"মনের মিল আর রঙের মিলের মানে
আমরা নাহি বুঝি;"

পথিক তখন একটুখানি হেসে
খানিক ভেবে, আস্তে আস্তে শেষে
বললে সোজাসুজি,—

"শক্ত কাজ আর বিপদ নিয়ে থাকে
বাইরে যারা, ঘরই তাদের ডাকে—
শান্তি যা'তে পায়,

ঘর গড়াতে তাই ছেলেদের টান,
সবুজ রঙই নির্ভয়-নিশান,
তাইতে সে রঙ চায়।

মেয়েরা সব ঘরের মধ্যে থেকে
ঘর আর বাড়ি নিত্য দেখে'-দেখে'
চিত্তে অবসাদ,

তাই তাহাদের কেল্লা গড়ার মন,
লাল রঙে তার গোপন আকর্ষণ
জানতে ভয়ের স্বাদ।

আলতা, সিঁদুর, পান ও শাড়ির পাড়
ভয়ের ভয়ে ফুরায় নাক তার
লুকিয়ে থাকে মনে,

তাই বলেছি দুই দলেরই জয়,
কেউ ভালো আর মন্দ কেউ আজ নয়;
সমান যে দুই জনে।"

জীবন ও সূর্য



কাজী নজরুল ইস্‌লাম

ভোরের বেলায় পূব-গগনে সূর্য্যিঠাকুর দেন উঁকি,
বলেন, "অলস, জড়ের মতন ব'সে ব'সে ভাব্‌ছ কী?
আমার আকাশ-মায়ের কোলে জাগি আমি ভোরবেলায়,
আমার হাসির উচ্ছলতা বনে বনে ফুল ফোটায়।
ক্রমেই যত ঊর্ধ্বে উঠি ততই আমি হই প্রখর,
শক্তি তেজের উজল দ্যুতি ছড়াই বিশ্বভুবন 'পর।
রঙে রঙে রাঙাই আকাশ, যখন সাঁঝে অস্ত যাই,
ত্রিলোক মলিন মোর বিদায়ে, যাবার বেলা দেখতে পাই।
তোমার জীবন এম্‌নি হবে, শৈশবে আনন্দময়,
যেথায় যাবে সেথাই যেন নূতন প্রাণের লহর বয়।
তোমার শক্তি-তপস্যাতে আস্‌বে কাছে ঊর্ধ্বলোক,
তোমার আলোক ঘুচিয়ে দেবে ত্রিজগতের দুঃখ-শোক।
এই পৃথিবীর আঁধার যত, এই মানুষের সকল ভয়
কর্‌বে মোচন শক্তি দিয়ে, শৌর্য দিয়ে, হে দুর্জয়!
দেশের—জাতির লজ্জা, গ্লানি, কলঙ্ক ও অসম্মান
তোমার তেজে দগ্ধ হবে, জাগ্‌বে বুকে নূতন প্রাণ।
যে সব আত্ম-অবিশ্বাসী ভয়ের গুহায় লুকিয়ে রয়,
তোমার ডাকে আস্‌বে ছুটে হে তেজোবীর, হে দুর্জয়!
যে আদর্শ-মানুষ আজও জন্মেনিকো এই ধরায়,
তুমিই হবে সেই সে মানুষ অধ্যবসায়, তপস্যায়।

সূর্য-সম শেষ-জীবনে রাঙিয়ে যাবে দিগ্বিদিক
যুক্ত-করে বিশ্ব নিখিল গাইবে তোমার মাঙ্গলিক।
অস্ত গেলে রবি যেমন জগৎ দেখ অন্ধকার,
হারিয়ে তোমায় কাঁদ্‌বে শোকে তেমনি মানুষ এই ধরার।"

পাছে লোকে কিছু বলে

কামিনী রায়

করিতে পারি না কাজ,
সদা ভয়, সদা লাজ,
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!

আড়ালে আড়ালে থাকি,
নীরবে আপনা ঢাকি'
সম্মুখে চরণ নাহি চলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!

হৃদয়ে বুদ্‌বুদ্‌ মতো
উঠে শুভ্র চিন্তা কত,
মিশে যায় হৃদয়ের তলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!

কাঁদে প্রাণ যবে, আঁখি
সযতনে শুষ্ক রাখি
নিরমল নয়নের জলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!

একটি স্নেহের কথা
প্রশমিতে পারে ব্যথা—
চ'লে যাই উপেক্ষার ছলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!

মহৎ উদ্দেশ্যে যবে
একসাথে মিলে সবে,
পারি না মিলিতে সেই দলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

বিধাতা দেছেন প্রাণ,
থাকি সদা ম্রিয়মাণ,
শক্তি মরে ভীতির কবলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

বাসনা

করুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

ছুট্‌ব আমি সরল প্রাণে
পর্ণ-কুটীর হ'তে,
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায়
ছুট্‌ব আলিপথে।

বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে.
শুকতারাটি জাগ্‌বে দূরে,
কান জুড়াবে পাখীর গানে
সুরের মিঠে স্রোতে।

বর্ষা যখন ছড়িয়ে দেবে
মোতির 'সাত-নরী',
কদম-কেশর শিউরে উঠে'
পড়্‌বে ঝরি' ঝরি';

মাঠের কোণে যাবে দেখা
বৃষ্টি-ধারার 'চিকে'-ঢাকা
কেয়াঝাড়ের মাথার 'পরে
নারিকেলের সারি।

শিল কুড়িয়ে বাঁধ্‌ব 'মোয়া',
লাঙল দেব ভূঁয়ে
কড়্‌ কড়্‌ কড়্‌ ডাক্‌বে 'দেয়া',
আস্‌ব আমন রুয়ে'।

আকাশ-ভাঙা মুষল-ধার,
বাঁশের ঝাড়ে কী তোলপাড়!
পাকুড় তেঁতুল ঝাউয়ের ঝাড়
পড়্‌বে নুয়ে' নুয়ে'!

কামার-শালে বস্‌ব গিয়ে
রৌদ্র এলে পড়ি',
কয়লাগুলো রাঙিয়ে দিয়ে
টান্‌ব জাঁতার দড়ি;

চালের কোলে জম্‌বে ধোঁয়া,
কাঁপিয়ে 'নেহাই' পিট্‌ব লোহা,
ছিটিয়ে দেব আগুন-জুঁই—
আলোর ছড়াছড়ি!

শুন্‌তে যাব ভারত-কথা,
রামায়ণের গান,
সীতার দুখে চোখের জলে
গল্‌বে মনঃপ্রাণ;

বনবাসের করুণ কথা
শুন্‌তে বুকে বাজ্‌বে ব্যথা
ফির্‌ব ঘরে দুঃখভরে
ক্ষুব্ধ ম্রিয়মাণ।

সারাদিনের শ্রান্তিভরা
শিথিল আঁখির পাতে
স্বপ্নহারা ঘুমের আরাম
ভোগ করিব রাতে!

না ফুটিতেই ঊষার আঁখি,
না ডাকিতেই ভোরের পাখী,
ঝংকারিব 'জয় জগদীশ'
প্রাণের 'একতারা'তে।

দীন দান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিবেদিল রাজভৃত্য, "মহারাজ, বহু অনুনয়ে
সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তোমার সোনার দেবালয়ে
না লয়ে আশ্রয় আজি পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়াতলে
করিছেন নাম-সংকীর্তন। ভক্তবৃন্দ দলে দলে
ঘেরি তাঁরে দরদর-উদ্বেলিত আনন্দধারায়
ধৌত ধন্য করিছেন ধরণীর ধূলি। শূন্যপ্রায়
দেবাঙ্গন; ভৃঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাণ্ড ফেলি
সহসা কমলগন্ধে মত্ত হয়ে দ্রুত পক্ষ মেলি
ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মীলিত পদ্ম-উপবনে
উন্মুখ পিপাসাভরে, সেইমতো নরনারীগণে
সোনার দেউল-পানে না তাকায়ে চলিয়াছে ছুটি
যেথায় পথের প্রান্তে ভক্তের হৃদয়পদ্ম ফুটি
বিতরিছে স্বর্গের সৌরভ। রত্নবেদিকার 'পরে
একা দেব রিক্ত দেবালয়ে।"
শুনি রাজা ক্ষোভভরে
সিংহাসন হতে নামি গেলা চলি যেথা তরুচ্ছায়ে
সাধু বসি তৃণাসনে; কহিলেন নমি তাঁর পায়ে,
"হেরো প্রভু, স্বর্ণশীর্ষ নৃপতিনির্মিত নিকেতন
অভ্রভেদী দেবালয়—তারে কেন করিয়া বর্জন
দেবতার স্তবগান গাহিতেছ পথপ্রান্তে বসে।"
"সে মন্দিরে দেব নাই" কহে সাধু।
রাজা কহে রোষে,
"দেব নাই! হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মতো কথা কহ।
রত্নসিংহাসন-'পরে দীপিতেছে রতন-বিগ্রহ—
শূন্য তাহা?"

"শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ" সাধু কহে,
"আপনায় স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নহে।"
ভ্রূ কুঞ্চিয়া কহে রাজা, "বিংশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া
রচিয়াছি অনিন্দিত যে-মন্দির অম্বর ভেদিয়া,
পূজামন্ত্রে নিবেদিয়া দেবতারে করিয়াছি দান,
তুমি কহ সে-মন্দিরে দেবতার নাই কোনো স্থান?"
শান্তমুখে কহে সাধু, "যে-বৎসর বহ্নিদাহে দীন
বিংশতিসহস্র প্রজা গৃহহীন অন্নবস্ত্রহীন
দাঁড়াইল দ্বারে তব, কেঁদে গেল ব্যর্থ প্রার্থনায়
অরণ্যে, গুহার গর্ভে, পথপ্রান্তে তরুর ছায়ায়,
অশ্বত্থবিদীর্ণ জীর্ণ মন্দির-প্রাঙ্গণে, সে-বৎসর
বিংশ লক্ষ মুদ্রা দিয়া রচি তব স্বর্ণদীপ্ত ঘর
দেবতারে সমর্পিলে। সে-দিন কহিলা ভগবান,—
'আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান
অনন্ত নীলিমা-মাঝে; মোর ঘরে ভিত্তি চিরন্তন
সত্য শান্তি দয়া প্রেম। দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ
নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে
সে আমারে গৃহ করে দান!' চলি গেলা সেইক্ষণে
পথপ্রান্তে তরুতলে দীন-সাথে দীনের আশ্রয়।
অগাধ সমুদ্র-মাঝে স্ফীত ফেন যথা শূন্যময়
তেমনি পরম শূন্য তোমার মন্দির বিশ্বতলে—
স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্বুদ!"

রাজা জ্বলি রোষানলে
কহিলেন, "রে ভণ্ড পামর, মোর রাজ্য ত্যাগ ক'রে
এ মুহূর্তে চলি যাও।"

সন্ন্যাসী কহিলা শান্ত স্বরে,
"ভক্তবৎসলেরে তুমি যেথায় পাঠালে নির্বাসনে
সেইখানে, মহারাজ, নির্বাসিত কর ভক্তজনে।"

হিমাচলে

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

জ্বলে শৈলে সূর্য-কিরণ-বিম্ব—
দলিত ছিন্ন কুজ্ঝটি
যেন তুষারে ধবলগিরির শৃঙ্গ—
ধেয়ান-মগ্ন ধূর্জটি।
ঐ সানুর সোপান-মালার ঊর্ধ্বে
শৃঙ্গ-চরণ-রঞ্জিকা,
শোভে অভ্র-সুষমা, যেন রে শুদ্ধা
গৌরকান্তি অম্বিকা।
তথা অর্ধ-ধূসর ভূধর-খণ্ড
দাঁড়ায়ে প্রান্তে গৌরবে,—
যেন নন্দীর মত রুদ্রপ্রহরী
দলিছে চরণে রৌরবে;
সেথা স্তব্ধ চপল বাসনা মানসে
হত লালসার উগ্রতা,
রাজে মৌন মুক্ত শঙ্কর-পদে
তাপসীর চারু শুভ্রতা!

রজনীকান্ত সেন

হিংসার ফল

পাখিরা আকাশে উড়ে দেখিয়া হিংসায়
পিপীলিকা বিধাতার কাছে পাখা চায়;
বিধাতা দিলেন পাখা, দেখো তার ফল,—
আগুনে পুড়িয়া মরে পিপীলিকা-দল।

মানবের গীত শুনি' হিংসা উপজিল,
মশক, বিধির কাছে সুকণ্ঠ মাগিল;
গীত-শক্তি দিল বিধি; দেখো তার ফল,—
নর-করাঘাতে মরে মশক সকল।

উচ্চ-নীচ

উড়িয়া মেঘের দেশে চিল কহে ডাকি',—
"কী কর, চাতক-ভায়া, ধূলি মাঝে থাকি?
কোথায় উঠেছি চেয়ে দেখো একবার,
এখানে আসিতে পার? সাধ্য কি তোমার?"

চাতক কহিছে,—"তবু নীচে দৃষ্টি তব;
সদা ভাব, 'কার কিবা ছোঁ মারিয়া লব!'
মেঘ-বারি ভিন্ন অন্য জল নাহি খাই,
তাই, আমি নীচে থেকে ঊর্ধ্বমুখে চাই।"

ঝর্‌না

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ঝর্‌না! ঝর্‌না! সুন্দরী ঝর্‌না!
তরলিত চন্দ্রিকা! চন্দন-বর্ণা!
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিক স্বর্ণে,
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি', যৌবন, তাপসী অপর্ণা!
ঝর্‌না!

পাষাণের স্নেহধারা! তুষারের বিন্দু!
ডাকে তোরে চিত-লোল উতরোল সিন্ধু।
মেঘ হানে জুঁইফুলী বৃষ্টি ও-অঙ্গে,
চুমা-চুম্‌কির হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে,
ধুলা-ভরা দ্যায় ধরা তোর লাগি ধর্‌না!
ঝর্‌না!

এসো তৃষ্ণার দেশে এসো কলহাস্যে—
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে।
ধূসরের ঊষরের করো তুমি অন্ত,
শ্যামলিয়া ও-পরশে করো গো শ্রীমন্ত;
ভরা ঘট এসো নিয়ে ভরসায় ভর্‌না;
ঝর্‌না!

শৈলের পৈঠায় এসো তনুগাত্রী!
পাহাড়ের বুক-চেরা এসো প্রেমদাত্রী!
পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো,
হরিচরণ-চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো,
স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্যে সুপর্ণা!
ঝর্‌না!

মঞ্জুল্‌ ও-হাসির বেলোয়ারী আওয়াজে
ওলো চঞ্চলা! তোর পথ হ'ল ছাওয়া যে!
মোতিয়া মতির কুঁড়ি মুরছে ও-অলকে;
মেখলায় মরি, মরি, রামধনু ঝলকে!
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা!
ঝর্‌না!

রাজবেশ

মোহিতলাল মজুমদার

রাজা গেছে বনে, গেছে তার সনে একটি সে অনুচর,
দুঃখের দিনে কেহ নাহি চিনে, সবাই হয়েছে পর।
শাল-দোশালার কিছু নাহি আর—নব নব বেশবাস,
রাজার দুলাল হয়েছে কাঙাল, এমনই সর্বনাশ।
তবু তার মন নহে অনুখন সেই শোকে ম্রিয়মাণ
যত বাজে বুকে তত হাসিমুখে সে ব্যথা সহিতে চান।
ফুরায়ে এসেছে আনিল যা' বেছে বসন দু'চারখানি—
বেদনা-কাতর রাজ-অনুচর প্রভু-প্রয়োজন মানি'।

একদা প্রভাতে দিল তুলি হাতে যেমনি জীর্ণবাস
রাজার বদনে ভ্রূকুটির সনে পড়িল দীর্ঘশ্বাস।
কহিলেন ডাকি,—"আর নাই নাকি? ফুরাইল এতদিনে?
এ কী পরমাদ বসনের সাধ ঘুচিল না মানহীনে।
নিশ্চয় আছে শেষ হয় পাছে—করিতেছ সঞ্চয়,
হৃদয় আমার তাই বার বার করিতেছে অবিনয়।
রাজার আসন ছাড়ে যেইজন বসন ছাড়িতে নারে।
ঐশ্বর্যের রাখে হেন জের—ভিখারী কহে তো তারে।
এক, সব পায়,—নয়, সব যায়—উভয়ের নাই দুখ;
রাজার মুকুটে আর জটাজুটে ভেদ নাই এতটুক।
গেছে রাজপাট তবু চাই ঠাট এ কী এ দুর্বলতা।
থাকে যদি বাকি, রাখিও না ঢাকি কহিও সত্যকথা।"

"সোনার সুতায় লতায় পাতায় কাজকরা আংরাখা
রাখিয়াছি প্রভু, রহিবেক তবু যতদিন যায় রাখা।

আর কিছু নাই যাহা ছিল তাই সেদিন দিয়াছি দানে
তোমার আদেশে,—প্রভু অবশেষে কী রহিবে পরিধানে?
অধীন জনের এ ভুল মনের ক্ষমা করো মহারাজ!
শুনিনু যে কথা ঘুচিয়াছে ব্যথা, পাইয়াছি বড়ো লাজ।”

রাজা কহে, “আজ ততোধিক লাজ আমি পাইয়াছি মনে,—
ওইটুকু শেষ আছে রাজ-বেশ; তা'রি হায় প্রলোভনে
ভিক্ষুক প্রাণ মানে অপমান করিছে কাঙালপনা;—
দাও প'রে লই এর পরে ওই চীরবাস হবে সোনা।
শয়তান মন মানিবে শাসন সব ফুরাবার পরে,
শিশুর মতন ভুলি ক্রন্দন ঘুমাইবে অকাতরে।”

গ্রাম্য ছবি

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

মাটিতে নিকানো ঘর দাওয়াগুলি মনোহর
সমুখেতে মাটির উঠান।
খড়ো চালখানি ছাঁটা, লতিয়া করলা লতা
মাচা বেয়ে করেছে উত্থান।
পিঁজারায় বস্ত্র বাঁধা বউকথা কহে কথা
বিড়ালটি শুইয়া দাবাতে;
মঞ্চে তুলসীর চারা গৃহে শিল্প কড়ি-ঝারা
খোকা শুয়ে দড়ির দোলাতে।
কানে দুল দুল্‌দুল্‌ গাছভরা পাকা কুল
ধীরে ধীরে পাড়ে দুটি বোনে;
ছোটো হাতে জোর ক'রে শাখাটি নোয়ায়ে ধরে,
কাঁটা ফুটে হাত লয় টেনে।
পুকুরে নির্মল জল, ঘেরা কলমীর দল,
হাঁস দুটি করে সন্তরণ,
পুকুরের পাড়ে বাঁশবন।
শূন্য জনকোলাহল কিচিমিচি পাখিদল,
সাঁই সাঁই বায়ুর স্বনন,
রোদটুকু সোনার বরন।
লুটায় চুলের গোছা, বালাদুটি হাতে গোঁজা,
একাকিনী আপনার মনে
ধান নাড়ে বসিয়া প্রাঙ্গণে।
শান্ত স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে গ্রাম্য মাঠে গোরু চরে,
তরুতলে রাখাল শয়ান,
সরু মেঠো রাস্তা বেয়ে পথিক চলেছে গেয়ে
সাথে মিশে ঘুঘুর সে তান।

ছায়াপথ

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

দুই ধারে ধানক্ষেতে আঁকা বাঁকা পথ;
ওই পথ দিয়া ধায় মোর মনোরথ।
ওই পথে আনাগোনা প্রীতির পড়েন টানা
যোগ ক'রে রেখেছিল স্বর্গ মরত।

পরিচিত প্রতি তরু—রূপ কী শ্যামল,
আহা কত আতিথেয়—ছায়াসুশীতল।
গুল্মের ফুলগুলি চাহিত যে মুখ তুলি
হরষ জানাত পাখি করি কলকল।

দিঘিভরা কমলেরা চাহি বার বার
প্রয়াস করিত যেন কথা কহিবার।
শঙ্খচিলের দল সুধাইত কি কুশল?
পথিকের প্রণতিতে পথ একাকার।

লাগেনাক ভালো এই জনকোলাহল।
সে-পথের লাগি মোর চিত চঞ্চল।
পলে পলে পায় প্রাণ সেই পথটির টান
তার সে মাটির মায়া করিছে বিকল।

পাকা পথে চলা মোর কভু কি মানায়?
চোখে জল ভরে উঠে কানায় কানায়।
মৃতমৃত্তিকাবৎ আছে ছায়া আছে পথ
হায় তারে 'ছায়াপথ' আর কে বানায়?

চাষার বেগার

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রাজার পাইক বেগার ধরেছে,
ক্ষেতে যাওয়া বন্ধ হ'ল আজ;
পরের কাজে কাটবে সারাদিন,
রইল প'ড়ে ঘরের যত কাজ।
আষাঢ় মাসে চাষের ক্ষেতে,
খাটছে সব দিনে ও রেতে
শেষ জো'য়েতে রুইব ব'লে বেরিয়েছিলাম আজ;—
পড়ল হঠাৎ রাজার বাড়ি কাজ!

লোকের ক্ষেতে নূতন চারাগুলি
সবুজ, যেন টিয়ে পাখির পাখা;
পাটের ডগা লক্‌লকিয়ে উঠে'
বালুরঘাটের বাজার দিল ঢাকা।
গাঙের জল বানের টানে,
আসল ধেয়ে গ্রামের পানে;
পল্লীপথ গরুর ক্ষুরে হ'ল যে কাদামাখা;
শস্যভারে পড়ল চরা ঢাকা।

উপর্ঝরন দারুণ বাদলে
ভাসছে জলে জীর্ণ কুঁড়েখান;
মোড়লের ঝি ভাবছে অধোমুখে—
বাঁচবে কিসে ছেলে দুটির প্রাণ!

'শ্যামলা' মোর দুঃখ বুঝে
দাঁড়িয়ে ভেজে চক্ষু বুঁজে',
সুদের দায়ে দাদাঠাকুর গোয়ালে দিলে টান;
রুইতে পেলে হ'ত ক' বিশ ধান।

জীর্ণ চালে হ'ল না আর দেওয়া
কোথাও দুটি পচা খড়ের গুঁজি,
রাজার কাজে বেগার দিতে লোক
মিলল না কি পল্লীখানি খুঁজি?
সারা সনের অন্ন ছাড়ি'
যেতেই হবে রাজার বাড়ি!
স্বর্ণচূড়ার বর্ণ সেথায় মলিন হ'ল বুঝি!
যাচ্ছি চলো, চক্ষু কান বুঁজি!

পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একদিন দেখিলাম, উলঙ্গ সে ছেলে
ধূলি-'পরে বসে আছে পা দুখানি মেলে।
ঘাটে বসি মাটিঢেলা লইয়া কুড়ায়ে
দিদি মাজিতেছে ঘটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে।
অদূরে কোমললোম ছাগবৎস ধীরে
চরিয়া ফিরিতেছিল সেই নদীতীরে।
সহসা সে কাছে আসি থাকিয়া থাকিয়া
বালকের মুখ চেয়ে উঠিল ডাকিয়া।
বালক চমকি কাঁপি কেঁদে ওঠে ত্রাসে
দিদি ঘাটে ঘটি ফেলি ছুটে চলে আসে।
এক কক্ষে ভাই লয়ে, অন্য কক্ষে ছাগ,
দুজনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ।
পশুশিশু, নরশিশু, দিদি মাঝে পড়ে
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয়ডোরে॥

রানার

সুকান্ত ভট্টাচার্য



রানার ছুটেছে তাই ঝুম্ ঝুম্ ঘণ্টা বাজছে রাতে
রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে,
রানার চলেছে রানার!
রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার—
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।

রানার! রানার!
জানা-অজানার
বোঝা আজ তার কাঁধে,
বোঝাই জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে;
রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয় হয়,
আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয়।
অবাক রাতের তারারা, আকাশে মিট্‌মিট্ করে চায়;
কেমন করে এ রানার সবেগে হরিণের মতো যায়!
কত গ্রাম, কত পথ যায় স'রে স'রে—
শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে;
হাতে লণ্ঠন করে ঠন্‌ঠন্ জোনাকিরা দেয় আলো
মাভৈঃ, রানার, এখন রাতের কালো।
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে,
দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে।

রানার! গ্রামের রানার!
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার;
শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ
ভীরুতা পিছনে ফেলে—
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর
অগ্রগতির 'মেলে',
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি,
নেই, দেরি নেই আর,
ছুটে চলো, ছুটে চলো, আরো বেগে
দুর্দম হে রানার॥

জননীর ব্যথা

কালিদাস রায়

রাত জেগে ছেলে পড়ে অবিরত কলস্বরে,
প্রবেশিকা পরীক্ষার পড়া।
যেন গোটা বাড়িখানি আসন্ন বিপদ জানি'
ভয়দ্বিধা উৎকণ্ঠায় ভরা।
অন্য ঘরে তার সাথে জননী জাগিয়া রাতে
অস্বস্তির সহিছে বেদনা—
না জানি কতই ব্যথা কত শ্রম-কাতরতা
পায় ছেলে, করিছে কল্পনা।

খোলা জানালার কাছে পেচক ডাকিছে গাছে
থেকে থেকে কাঁদিছে কুকুর।
বারোটার রেলগাড়ি চলে গেছে ডাক ছাড়ি,
ফাঁড়িতেও বেজেছে দুপুর।
ভেসে আসে দূর হ'তে ফাল্গুনী বায়ুর স্রোতে
পিপাসিত শিশুর কাঁদন।
কিশোর ছেলের সাথে একাই মা জাগে রাতে,
জাগে সাথে মায়ার বাঁধন।

মনে ভাবে বার বার ছেলের বদলে তার
মা'র শ্রমে হ'ত যদি ফল,
তা হ'লে নিজেই গিয়া ছেলেরে বিশ্রাম দিয়া
করিত সে শ্রম অবিরল।
পড়িতে পড়িতে ছেলে একান্তই ঘুম পেলে
পুঁথি-বুকে ঘুমাইয়া পড়ে,
সন্তর্পণে মাতা গিয়া মশারিটি খাটাইয়া
দেয় ধীরে, যেন চুরি করে।

চুরি ছাড়া কিবা আর?   হ'রে লয় ক্লেশ-ভার,
ভাবে, আহা, একটু ঘুমাক,
যা আছে কপালে হবে,   এত পড়া কেন তবে?
বিদ্যা পরে, আগে বেঁচে থাক।
এ জননী জানে না কি   এ সময়ে দিলে ফাঁকি
হবে সারা জীবনই বঞ্চনা?
যাহারা হয়েছে বড়ো   তাহারা কঠোরতর
করেছে যে তপস্যা-সাধনা?

পুত্র-ভাগ্যবতী ব'লে   গৌরব পাইতে হ'লে
মূঢ় মায়া হবে ত্যজিবারে—
জানে না কি জননী তা   এ শ্রম হবে না বৃথা,
লক্ষ্মী আসে উদ্যমীর দ্বারে?
যুঝে মাতৃমমতার   সাথে শুভবাঞ্ছা তার,
মহাদ্বন্দ্ব চলে মা'র প্রাণে।
এ দ্বন্দ্বের কী যে ব্যথা   অন্য কেবা বুঝিবে তা
নিদ্রাহারা জননীই জানে॥

বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায়

জসীমউদ্‌দীন

রাত দুপুরে মেঘে মেঘে কড়াৎ কড়াৎ শব্দ যখন হয়,
দুই নখেতে আঁধার চিরি বিজলী যখন জ্বলে ভুবনময়;
তুফান ছোটে জোর দাপটে, বৃষ্টি পড়ে মেঘের ঝাজর ঝ'রে,
বছিরদ্দির ঘুম ভেঙে যায়—মুহূর্তে সে রইতে নারে ঘরে।
বিলের জলে টাইটুবানি রোহিত বোয়াল মাছেরা দেয় ফাল,
কই মাগুরের দল সাঁতারে আঁকা বাঁকা ধরি গাঁয়ের খাল;
এমন সময় বছিরদ্দি এক হাতেতে তীক্ষ্ম টেটা ধ'রে,
আর-এক হাতে মশাল জ্বালি বীর দাপটে ছোটে মাঠের 'পরে।

বুড়ীর ভিটায় বেড়াল ডাকে, তাল তলাতে গলায় দড়ি দিয়ে,
মরেছিল তাঁতীর বধূ,—এ সবে তার কাঁপায়নাক হিয়ে।
শেওড়া-বনে পেত্নী নাচে, হাজরাতলায় পিশাচে দেয় শিস,
বিলের ধারে আগুন জ্বালি ভূতেরা সব ফিরছে নানা দিশ।
ভয় নাহি তার কারও কাছে, রাতের আঁধার মশাল দিয়ে ঠেলে,
একলা চলে বছিরদ্দি জোর দাপটে চরণ দু'খান ফেলে।
হাতে তাহার তীক্ষ্ম টেটা, গায়ে তাহার মোষের মতো জোর,
চোখ-দুটিতে উল্কা জ্বলে যমদূতেরও দেখে লাগে ঘোর।

রাত দুপুরে বিলের পথে বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায়,—
দূর হ'তে তার মশাল জ্বলে ধকো ধকো রাতের কালো ছায়।
বৃষ্টি-শিলা মাথায় পড়ে তুফান চলে ক্ষিপ্ত ঘোড়ার মতো,
র'য়ে র'য়ে বিজলী জ্বলে, ইন্দ্র ডাকি আঁধার করি ক্ষত;
শ্মশানঘাটায় পেত্নী নাচে, বটের শাখে পিশাচ দোলা খায়,
রাত দুপুরে বিলের পথে বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায়।

পরিশিষ্ট

অনুশীলনী

গদ্যাংশ ঃ

ভারতের সম্পদ—স্বামী বিবেকানন্দ

অংশটি 'পরিব্রাজক' হইতে সংকলিত। এই প্রবন্ধটিতে স্বামীজী ভারতের শ্রমজীবীদের উদ্দেশে যে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করিয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ মূল্য আছে। মানুষ শ্রম দ্বারা সম্পদ উৎপন্ন করে। কাজেই শ্রমজীবী মানুষই জাতির সম্পদ। অথচ সমাজে তাহারা উপেক্ষিত ও নিগৃহীত।

১। 'ভারতের সম্পদ' বলিতে লেখক কাহাদের বুঝাইয়াছেন? ইহারা কেন সম্পদ, তাহা লেখকের যুক্তি অনুসরণ করিয়া ব্যাখ্যা কর।

২। প্রসঙ্গ নির্দেশপূর্ব্বক ব্যাখ্যা লিখ :—
(ক) যাদের রুধিরস্রাবে...............গুণগান কে করে?
(খ) বড়ো কাজ হাতে এলে............প্রণাম করি।

৩। টীকা লিখ :—
কিংখাব, নিয়ার্কুস, ভিনিস্, জেনোয়া, কাব্যবীর।

গঙ্গাবক্ষে—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবন্ধটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত হইতে সংকলিত। 'আত্মচরিত' বাংলা সাহিত্যের সম্পদ; শুধু যে লেখক ঠাকুর-পরিবারের ইতিহাস ইহাতে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নয়। ইহাতে তাঁহার আত্ম-উপলব্ধির কথা সাহিত্যিক সুষমামণ্ডিত হইয়া পরিবেশিত হইয়াছে।

১। 'গঙ্গাবক্ষে' নিবন্ধ হইতে একটি ঝড়ের বর্ণনা দাও।

২। টীকা লিখ :—রাজনারায়ণ বসু, পিনিস।

৩। পদ পরিবর্ত্তন করিয়া বাক্য রচনা কর :—
দীপ্ত, আশঙ্কা, চক্ষু, নক্ষত্র, অবিশ্রাম, ঘুম।

শৈলেশ্বরের মন্দিরে—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে অংশটি সংকলিত। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস রোমাঞ্চজাতীয় রচনা; নাটকীয়তা ও চমৎকারিত্ব ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখানেও ঝড়ের আকস্মিক আবির্ভাবের মুহূর্তে শৈলেশ্বরের মন্দিরে উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার আকস্মিক সাক্ষাৎ হইবে। উভয়েই উভয়ের নিকট অপরিচিত। দুর্গেশনন্দিনীর ভাষায় বঙ্কিমের বিশিষ্ট ভাষার স্বাক্ষর আছে; বিষয় ও অনুভব-ভেদে ভাষার রঙ বদলাইয়াছে।

১। শৈলেশ্বরের মন্দিরে রমণী ও যুবকের কথোপকথনের সারাংশ দাও।

২। বাক্য রচনা কর :—
যৎপরোনাস্তি, নীলনীরদমালা, নৈদাঘ, কুশাঙ্কুর, প্রান্তর, কোষসংবদ্ধ, মনোজ্ঞ, উষ্ণীষ।

পিতৃদেব—শিবনাথ শাস্ত্রী

'আত্মচরিত' হইতে সংকলিত। চরিত্র চিত্রণে লেখকের দক্ষতার পরিচয় আছে।

১। হরানন্দ ভট্টাচার্য্যের চরিত্রচিত্রণ কর।

২। "ইহার পরে কি আর নাকীসুরে—'দেখো শিশুগণ, চুঁরি করা বড়োঁ পাঁপ,' এরূপ উপদেশ আবশ্যক হয়?" কোন্ ঘটনা উপলক্ষে লেখক এই উক্তি করিয়াছেন। লেখকের নিবন্ধ হইতে অনুরূপ কয়েকটি ঘটনা বল।

৩। সমাস বিশ্লেষণ কর :—
স্কুলঘর, দৃঢ়নিবদ্ধ, যথাসময়ে, অগ্নিশর্মা, গৃহস্থ, আগ্নেয়গিরি, কোটামাছ।

ছুটি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'গল্পগুচ্ছ' হইতে এই গল্পটি গৃহীত। গ্রাম্য বালকের জীবনে শহুরে জীবনের মর্মান্তিকতা বর্ণিত হইয়াছে।

১। ফটিকের গ্রাম-জীবন ও শহর-জীবনের দুইটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চিত্র দাও।
২। গল্পটির সারাংশ দাও।
৩। গল্পটি তোমার কেমন লাগিল, তাহা বল।
৪। ব্যাখ্যা লিখ :—
"মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।"

আর্কিমিদিসের আবিষ্কার—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

'জগৎকথা' হইতে প্রবন্ধটি সংকলিত।

১। গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমিদিসের আবিষ্কৃত তথ্যের বিবরণ দাও।
২। ব্যাখ্যা লিখ :—
শাস্ত্রে বলে, বিজ্ঞানই আনন্দ।

মানুষের জয়যাত্রা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'যাত্রা' নামক প্রবন্ধ হইতে অংশটি সঙ্কলিত।

১। 'মানুষের জয়যাত্রা' বলিতে রবীন্দ্রনাথ কি বুঝাইয়াছেন? প্রবন্ধটির সারাংশ দাও।
২। প্রসঙ্গ নির্দেশপূর্বক ব্যাখ্যা লিখ :—
(ক) ঘোড়ার সর্বাঙ্গে যে............লোভ হইল।
(খ) দেখিলে মনে হয় লক্ষ লক্ষ ইস্কুলের ছেলে............দিতে চায়।
(গ) বাধাহীন জলরাশির............মানুষের কামনা।
(ঘ) ক্রুদ্ধ সাগর পিঠ............করিয়া দিল।
৩। বাক্য রচনা কর :—
বিদ্যুৎগামী, জারিজুরি, মন্দগামী, বুনো, অবাধ্য।

কলিকাতা আক্রমণ—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

'সিরাজদ্দৌলা' হইতে সঙ্কলিত।

১। কলিকাতা আক্রমণের একটি বিবরণ দাও।
২। টীকা লিখ :—
ফিরিঙ্গি, ফরাসী বণিকের মর্মভেদী পরিহাস, আরমানী, শওকতজঙ্গ, ফৌজদার, পৃষ্ঠপ্রদর্শন।

সব্যসাচী—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখকের বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের দাবী' হইতে গৃহীত। সঙ্কলিত অংশটিতে ও 'পথের দাবী' উপন্যাসের নায়ক-চরিত্রের রহস্যময় অসামান্যতার পরিচয় আছে।

১। নিমাইবাবু ও গিরিশ মহাপাত্রের কথোপকথনের সার সঙ্কলন কর। গিরিশ মহাপাত্র কে?
২। প্রসঙ্গ নির্দেশপূর্বক ব্যাখ্যা লিখ :—
(ক) বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু শখ ষোল আনাই বজায় আছে তা স্বীকার করতে হবে।
(খ) আজ্ঞে, পথে কুড়িয়ে পেলাম, যদি কারও কাজে লাগে তাই তুলে রেখেছি।

বাংলার সংস্কৃতি—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখকের গ্রন্থাবলী হইতে সঙ্কলিত।

১। বাংলার সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বর্ণনা কর।

২। টীকা লিখ :—
আগমনী, মিথিলা, নব্যন্যায়, কীর্তন, নবদ্বীপ, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, ভুটান, ঘনশ্যাম, লাউসেন, পাঁচালী, কবির গান, পঙ্খের কাজ, নৌশিল্প।

গ্রীক শিবিরে চন্দ্রগুপ্ত—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের প্রথম অঙ্কের ১ম দৃশ্য।

১। 'যাও বীর! তোমায় বন্দী করব না! আমি পরীক্ষা করছিলাম মাত্র।'—কে কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন? তিনি কি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন?

২। চন্দ্রগুপ্ত চরিত্র বর্ণনা কর।

৩। ব্যাখ্যা কর :—
(ক) বাধা পেলাম প্রথম—সেই শতদ্রুতীরে।
(খ) ভারতবাসী মিথ্যাকথা বলতে এখনও শিখে নাই।

টাকার কথা—অনাথগোপাল সেন

'টাকার কথা' গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।

১। টাকার জন্ম-কাহিনী ও তাহার বিবর্তন ইতিহাস বর্ণনা কর।

২। টীকা লিখ :—
বিনিময়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, নির্দিষ্ট ওজন, সুদ।

দেশবন্ধু প্রসঙ্গ—সুভাষচন্দ্র বসু

'তরুণের স্বপ্ন' হইতে সঙ্কলিত। লেখক দেশবন্ধুর রাজনৈতিক শিষ্য।

১। দেশবন্ধু চরিত্রের মাহাত্ম্য কোথায়, তাহা দেখাও।

২। ব্যাখ্যা লিখ :—
(ক) আমার মুশকিল এই যে আমি তাকে ঘৃণা করতে পারি না।
(খ) তিনি শিক্ষার (Culture) দিক দিয়া হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে মৈত্রী সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেন।

দেবী মনসার ক্রোধ—দীনেশচন্দ্র সেন

লেখকের 'বেহুলা' হইতে সঙ্কলিত।

১। দেবী মনসার ক্রোধের কারণ কি ও তাহার পরিণতি কি হইল?

২। অর্থ লিখ :—
সান্ত্রী, তৃণশষ্প, বহুশীর্ষ, বিষহরি, কালনিদ্রা, সায়বেনের ঝি, কালনাগিনী, হিন্তাল।

জাতীয় আন্দোলনের এক অধ্যায়—জওহরলাল নেহরু

'আত্মজীবনী'র একাংশ। প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের অনুবাদ।

১। ১৯৩০ সালের আন্দোলনের একটি চিত্র দাও।

২। টীকা লিখ :—
সীমান্ত প্রদেশের ঘটনাবলী, লবণগোলা আক্রমণ, পিকেটিং, সত্যাগ্রহ, ডান্ডি।

অপুর স্বপ্ন—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখকের 'পথের পাঁচালী' হইতে গৃহীত।

১। "সে-ও তাহার মা ও দিদির মতো স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছে।" এই 'সে'টি কে? তাহার স্বপ্নের বিবরণ দাও।

২। অপুর মাছ ধরার দৃশ্যের বর্ণনা দাও।

৩। প্রসঙ্গ নির্দেশপূর্বক ব্যাখ্যা লিখ :—
(ক) ক্রমে বেলা যায়, নদীর ধারের মাঠে...........শেষ রোদ।
(খ) নিজেকে সে 'বঙ্গবাসী' কাগজের...........কল্পনা করে।
(গ) আর দিনকতক পরে...........আহ্বান করিবে?

ভারতের নিকট আরবের ঋণ—প্রফুল্লচন্দ্র রায়

১। ভারতের নিকট আরবের ঋণের পরিমাপ কর।

২। টীকা লিখ :—
গ্রীক সভ্যতা, কিতাব্-অল-ফিরিস্ত্, খলিফা, আলবেরুনি।

বেদুয়িনের তাঁবুতে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'পারস্যে' নামক ভ্রমণ-কাহিনী হইতে গৃহীত।

১। বেদুয়িনের তাঁবুতে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

বাংলার নদনদী—নীহাররঞ্জন রায়

'বাংলার নদনদী' নামক পুস্তিকা হইতে সংকলিত।

১। "বাংলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে বাংলার ছোটোবড়ো অসংখ্য নদনদী"—উক্তিটির যাথার্থ্য প্রমাণ কর।

মহাপ্রস্থানের পথে—প্রবোধকুমার সান্যাল

'মহাপ্রস্থানের পথে' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ হইতে সংকলিত।

১। লেখকের লিখিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা হইতে দুইটি চিত্র উদ্ধার করিয়া দাও।

২। ব্যাখ্যা লিখ :—
(ক) এবার নদী ছুটেছে...........ছুটেছে স্বর্গে।
(খ) এ যেন কোন্ বিরাটের...........আলিঙ্গন হবে।
(গ) দেবতার কাছে এসে......অনুভব করি।

খোকাখুকি—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১। 'রূপকথা' হিসাবে 'খোকাখুকি' কতদূর সার্থক?

২। গল্পটি নিজের ভাষায় বল।

৩। অর্থ লিখ :—
চোখের জলে ভেজা একটুখানি আদর, মায়া-কান্না।

উত্তরমেরু অভিযান—কালিদাস রায়

১। উত্তর মেরু অভিযানের বীরত্ব কাহিনী বর্ণনা কর।

২। ন্যানসেনের অভিযান কাহিনী বর্ণনা কর।

ভারতের প্রকৃতি—প্রমথ চৌধুরী

১। ভারতের ভৌগোলিক প্রকৃতি বর্ণনা কর।

২। টীকা লিখ :—
জন্মভূমি, ঋষির আশ্রম, ট্রপিক অব ক্যান্সার।

যুধিষ্ঠিরের শিষ্টাচার—রাজশেখর বসু

'মহাভারতে'র সারানুবাদ হইতে সংকলিত।
১। রণক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের শিষ্টাচারের বিবরণ দাও।
২। ব্যাখ্যা লিখ :—
এই কুলাঙ্গার ভয় পেয়ে...........ভীত হ'ল কেন?

মেরী কুরী—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী' হইতে সংকলিত।
১। মেরী কুরীর জীবনী বর্ণনা কর।
২। রেডিয়ম আবিষ্কারের বিবরণ দাও।
৩। টীকা লিখ :—
নোবেল পুরস্কার, আইনস্টাইন, রেডিয়ম।

পদ্যাংশ ঃ

ভারতলক্ষ্মী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এটি একটি গান। জাতীয় সংগীত। গাহিবার জন্য, ব্যাখ্যার জন্য নয়।
১। কবিতাটি মুখস্থ লিখ।

ব্যাঘ্রসহ কালকেতুর যুদ্ধ—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

চণ্ডীকাব্যের কালকেতুর উপাখ্যান হইতে উদ্ধৃত।
১। ব্যাঘ্রের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ বর্ণনা কর।
২। ব্যাখ্যা লিখ :—
বাঘ দেখি আকর্ণ পূর্ণিত কৈল বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া বীর করিল সন্ধান॥

দক্ষযজ্ঞ নাশ—ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

'অন্নদামঙ্গল' হইতে উদ্ধৃত।
১। প্রথম আট পংক্তি মুখস্থ লিখ।
২। ব্যাখ্যা লিখ :—
ঊর্ধ্ববাহু যেন রাহু
চন্দ্র-সূর্য পাড়িছে।

অরণ্য—বিহারীলাল চক্রবর্তী

'সংগীতশতক' হইতে সংকলিত।
১। অরণ্যের একটি ভাষা-চিত্র অংকন কর।

দুরন্ত ঝটিকা—অক্ষয়কুমার বড়াল

১। প্রথম স্তবকটি মুখস্থ লিখ।
২। প্রসঙ্গ নির্দেশপূর্বক ব্যাখ্যা লিখ :—
(ক) উঠিতেছে চারিদিকে......ধূ ধূ জ্বলি'।
(খ) মনে হয়,—পাই...........জন্মমৃত্যু-স্থান।

প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

'মেঘনাদবধ কাব্য' হইতে সঙ্কলিত।
১। প্রমীলা চরিত্র অঙ্কন কর।
২। প্রসঙ্গ নির্দেশপূর্বক ব্যাখ্যা লিখ :—
(ক) পর্বত-গৃহ.....................গতি?
(খ) দানবনন্দিনী আমি.....................নৃমণি।
(গ) যথা বায়ু-সখা.....................অগ্নি-শিখা?
৩। টীকা লিখ :—হৈমবতী, গজ-পতি-গতি, ডমরুর রবে যথা নাচে কালফণী।

কুরুক্ষেত্র—নবীনচন্দ্র সেন

'কুরুক্ষেত্র' কাব্য হইতে গৃহীত।
১। 'কুরুক্ষেত্রে' শোকের কারণ কি? দৃশ্যটি বর্ণনা কর।
২। ব্যাখ্যা লিখ :—বীরশোক অশ্রু নহে, অসির ঝংকার।

পরশমণি—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'কবিতাবলী' হইতে সঙ্কলিত।
১। 'পরশমণি' বলিতে কবি কি বুঝাইয়াছেন।
২। প্রসঙ্গ নির্দেশপূর্বক ব্যাখ্যা লিখ :—
(ক) পরশমণির সনে............নিখিল ভুবন!
(খ) জ্বলন্ত বিদ্যুৎলতা, তমিস্রা রজনী।
৩। টীকা লিখ :—জননী-বদন-ইন্দু, ইন্দ্রধনু-আলো, ইন্দীবর-আঁকা।

বিদ্যাসাগর—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

'চতুর্দশপদী কবিতা' হইতে সঙ্কলিত। সনেট ১৪ পংক্তিতে সমাপ্ত।
১। কবি "করুণার সিন্ধু" কাহাকে বলিয়াছেন? কবিতাটির সারমর্ম দাও।
২। ব্যাখ্যা লিখ :—
(ক) বিদ্যার সাগর তুমি.....................কিরণে।
(খ) দীর্ঘ-শিরঃ তরু-দল..................দূর করে!

বঙ্গভাষা—অতুলপ্রসাদ সেন

বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত।
১। কবিতাটি মুখস্থ লিখ।
২। ব্যাখ্যা লিখ :—
(ক) ওই ভাষাতেই নিতাই.....................নাশা।
(খ) বিদ্যাপতি, চণ্ডী..................যাওয়া-আসা।

জন্মভূমি—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত; 'সাজাহান' নাটক হইতে সঙ্কলিত।
১। যে কোন একটি স্তবক মুখস্থ লিখ।
২। কবি স্বদেশকে 'সকল দেশের রাণী' বলিয়াছেন কেন?

কয়াধু—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবির 'কাব্য-সঞ্চয়ন' হইতে সঙ্কলিত।
১। কয়াধুর আক্ষেপোক্তির সারাংশ দাও।

২। ব্যাখ্যা কর :—
(ক) যে দিকে চাই........................নীরব অভিযোগ।
(খ) খেদ কিছু নাই......................উজ্জ্বল!

বর্ষা-সুন্দরী—মানকুমারী বসু

১। বর্ষার সৌন্দর্যের বর্ণনা দাও।

ছেলে ও মেয়ে—যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

১। পাথিক 'দুই দলেরই জয়' কেন বলিলেন? কাহিনীটি নিজের ভাষায় বল।

জীবন ও সূর্য—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

১। কবিতার মূল ভাববস্তু কি?
২। ব্যাখ্যা কর :—
(ক) আমার আকাশ-মায়ের......................ফোটায়।
(খ) সূর্য-সম......................এই ধরার।

পাছে লোকে কিছু বলে—কামিনী রায়

১। লোকনিন্দার ভয়ে যে আমরা কর্তব্যচ্যুত হই নিজের ভাষায় তাহা প্রকাশ কর।
২। ব্যাখ্যা লিখ :—
(ক) হৃদয়ে বুদবুদ......................কিছু বলে!
(খ) বিধাতা দেছেন প্রাণ............কিছু বলে!

বাসনা—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

১। প্রথম স্তবকটি মুখস্থ লিখ।
২। কবির 'বাসনা'র সারাংশ দাও।
৩। ব্যাখ্যা লিখ :—
(ক) মাঠের কোণে............নারিকেলের সারি।
(খ) শুন্‌তে যাব ভারত-কথা..................মনঃপ্রাণ।
(গ) বনবাসের করুণ কথা..................ম্রিয়মাণ।

দীন দান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১। 'দীন দান' কবিতাটির সার সঙ্কলন কর। এখানে কোন্ দানকে দীন বলা হইয়াছে এবং কেন?
২। ব্যাখ্যা লিখ :—ভক্তবৎসলেরে........................ভক্তজনে।

হিমাচলে—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

১। যে কোন আটটি চরণ মুখস্থ লিখ।
২। টীকা লিখ :—রৌরবে, শৃঙ্গ-চরণ-রঞ্জিকা, রুদ্রপ্রহরী, নন্দী।
৩। ব্যাখ্যা লিখ :—সেথা স্তব্ধ.................চারু শুভ্রতা!

অমৃত কণা—রজনীকান্ত সেন

১। কবিতা দুইটির মূল ভাব সম্প্রসারিত কর।

ঝর্‌না—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১। যে কোন একটি স্তবক মুখস্থ লিখ।
২। ব্যাখ্যা লিখ :—(ক) এসো তৃষ্ণার দেশে..................ঝর্‌না!
(খ) শৈলের পৈঠায়..................ঝর্‌না!

রাজবেশ—মোহিতলাল মজুমদার

১। 'রাজবেশ' পরিধানে কে লজ্জা পাইলেন? লজ্জা পাইয়া কি করিলেন? কবিতাটির মূল ভাব কি?
২। ব্যাখ্যা লিখ :—শয়তান মন..............ঘুমাইবে অকাতরে।

গ্রাম্য ছবি—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

১। কবিতাটি অবলম্বনে একটি গ্রাম্যছবি অঙ্কন কর।

ছায়াপথ—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

১। কবির হৃদয়-অনুভূতির পরিচয়টুকু 'ছায়াপথ' কবিতায় যে ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে তাহার সারাংশ দাও।
২। ব্যাখ্যা লিখ :—পাকা পথে..............আর কে বানায়?

চাষার বেগার—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

১। 'চাষার বেগার' কবিতায় অভিযোগ কি? আজও সে অভিযোগের অবসান হইয়াছে কি?
২। ব্যাখ্যা লিখ :—
(ক) লোকের ক্ষেতে..............দিল ঢাকা।
(খ) 'শ্যামলা' মোর..............বিশ ধান।
(গ) জীর্ণ চালে..............খুঁজি?
(ঘ) সারা সনের অন্ন..............বুঁজি'।

পরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১। কবিতাটির মূল ভাব কি? তাহার সারাংশ দাও।
২। ব্যাখ্যা লিখ :—পশুশিশু, নরশিশু...........পরিচয়ডোরে।

রানার—সুকান্ত ভট্টাচার্য

'ছাড়পত্র' কাব্য হইতে সংকলিত।
১। প্রথম স্তবকটি মুখস্থ লিখ।
২। 'রানার' কবিতায় শ্রমজীবী জনগণের প্রতি কবির কোন্ অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে?
৩। 'রানার' কবিতাটি অবলম্বন করিয়া রানার-জীবনের একটি আলেখ্য অংকন কর।
৪। প্রসঙ্গ নির্দেশপূর্বক ব্যাখ্যা লিখ :—
(ক) দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে।
(খ) শপথের চিঠি..............'মেলে'।

জননীর ব্যথা—কালিদাস রায়

১। পরীক্ষার্থী ছেলের মায়ের ব্যথা এই কবিতায় যেটুকু প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার বিবরণ দাও।
২। ব্যাখ্যা লিখ :—
(ক) ভেসে আসে দূর হ'তে...........মায়ার বাঁধন।
(খ) বুঝে মাতৃমমতার..............জননীই জানে।

বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায়—জসীমউদ্দীন

১। কবিতাটি অবলম্বন করিয়া একটি মাছ-ধরার দৃশ্য বর্ণনা কর।
২। টীকা লিখ :—মেঘের ঝাজর, টেটা, হাজরাতলা, যমদূত, টাইটুবানি।

লিলি—১০,০০০